KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৬ নন্দী লেন, চাকদহ, নদীয়া-৭৪১২৫৮
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রবীরেন্দু সরকারপুত্র
Title : আলিন্দ (ALINDA)	Size : ৪.৫"/৫.৫"
Vol. & Number : ১ম (শ্রীষ্মর সংকলন) ২য় (শরৎ সংকলন) ৩য় (শীত সংকলন) ৪র্থ (বসন্ত সংকলন)	Year of Publication : ১৩৯১ ১৩৯২ ১৩৯৩ ১৩৯৪ Condition : Brittle / Good
Editor : প্রবীরেন্দু সরকারপুত্র	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

গ্রীষ্ম সংকলন

১৩৯১

অপিনদ্ধ

সম্পাদক

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

আলিন্দ

ত্রৈমাসিক সাহিত্য সংকলন

গ্রীষ্ম ১৩৯১

এই সংখ্যায় লিখেছেন :

শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, নবনীতা দেবসেন, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, আলোক সরকার, সমরেন্দ্র-সেনগুপ্ত, মানস রায়চৌধুরী, শান্তিকুমার ঘোষ, কবিরুল ইসলাম, অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ গুহ, মৃণাল দত্ত, অশোক দত্তচৌধুরী, অমিতাভ দাস, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, রথীন্দ্র মজুমদার, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, সুভদ্রা ভট্টাচার্য, ভাস্কর চক্রবর্তী, সুব্রত রুদ্র, রাণা চট্টোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী, অভী সেনগুপ্ত, পঞ্চানন মালাকার, জয় গোস্বামী, তপন ভট্টাচার্য, সুজিত সরকার, মবিনুল হক, দাউদ হায়দার, জহর সেন মজুমদার, সুবোধ সরকার, সুতপা সেনগুপ্ত, সোফিওর রহমান, রাখাল বিশ্বাস, অনুরাধা মহাপাত্র, দেবদাস আচার্য, অরণি বসু, সুব্রত সরকার, মল্লিকা সেনগুপ্ত, গৌতম বসু, দেবব্রত ঘোষ, অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়, বিভয়া মুখোপাধ্যায় সুবিনয় ধর, শুকতারা রায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত।

সম্পাদক ও প্রকাশক : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ : মেরিঅ্যান দাশগুপ্ত

পৃষ্ঠপোষক : ডক্টর পার্থ দাশগুপ্ত

মুদ্রণ : ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস। কলকাতা-৯

দাম : চার টাকা

"অলিন্দ" ষান্মাষিক সাহিত্য-সংকলন।
প্রতি সংকলনের দাম চারটাকা।
গ্রাহক করা হয় না।
লেখকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যদি
তাঁদের রচনা বিষয়ে সম্পাদকের মতামত জানতে চান,
তাহ'লে যেন ডাকটিকিট-সহ খাম পাঠান।

□

লেখা, বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য বিষয়ে
যোগাযোগের ঠিকানা :
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
৩ নর্থ রোড, যাদবপুর,
কলকাতা ৭০০০৩২

টেলিফোন-৭২-৭০২৫

জলছবি

বিচ্ছেদ

রাতের বেড়ালগুলি বড়ো বেশি দ্রুত
লাল সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।
আমিও কুয়াশা মাখা চোখে
ধরতে গিয়েছি একে ওকে
ফিরে দেখি সেও নেই, রোমে ভরে আছে শুধু
একদিন যেখানে সে শুত

ভিখিরি

বুকের মধ্যে কত-যে ভিখিরি রেখছ
কত দিকে বাটি বাড়াও—
মন্বন্তরে কে আর তোমাকে বাঁচাবে !

কলেজ স্ট্রিটের রাস্তা চতুর্ভুজা।
তার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছ হঠাৎ উলটো হাতে
আলস্যময় বাটি ভরে যায় করুণাতে করুণাতে !

মুখ

আকথা কুকথা পাঁচকথা বলে গলি দিয়ে চলে যাবে
মুখমণ্ডল সাজানো থাকবে কতমতো কিংখাবে
সুড়ঙ্গ পথে এলিয়ে-উলিয়ে ফিরে আসবার পর
ঘনমনুষ্য সূর্যোজ্জ্বল তুমি নও কারো তাঁবে !

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শরৎশীত : ট্র্যাবিঙ্গেনে

ভাট আর চারণেরা
আকাশে কাশফুল রেখে ঘুমোতে গিয়েছে

এতদিন স্তবস্তুতি হয়েছে অনেক,
প্রার্থনার মধ্যে ছিল পুঞ্জ অবসন্নতা, এখন
ঈশ্বর তোমার মুখে চেয়ে
স্তাবকাবনম্রতার প্রহর ফুরিয়ে গেছে, কোন কাশফুল
চামর হবে না আর।
এবার তোমাকে প্রধানত
ভালোবাসবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে নরনারী

তুমি নিজে অন্তত নেবার জন্য তৈরি আছো তো ?

নবনীতা দেবসেন

দাতুমর্হসি

দিতে চাও ?
কে নেবে ? কী নেবে ?
তোমার হাতের দিকে চেয়ে ছাখো
হাতে কিছু নেই

অঞ্জলি বেঁধেছো বটে
অঞ্জলিতে আকাশ বাতাস
বেলা, কি অবেলা
কিছু নেই—

মস্তো বড়ো 'নেই' বসে আছে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ভালোবাসা আদরের দিন

চর জেগে উঠেছে গঙ্গার।
পটভূমি তিনপাহাড়
পাকা টমাটোর মতো পশ্চিমে সূর্যের
চর ছুঁয়ে ডুবে যাওয়া !
পাখিরা রয়েছে
এখনো চরের বালি উত্তপ্ত রেখেছে
কোলাহল।
সবুজ গমের পাশে মুথা ঘাস রয়েছে সজাগ
মোষের সাঁতার কেন চরের উদ্দেশে
সেকারণ স্বচ্ছ,স্পষ্ট বিজলির আলোর মতন
গঙ্গাভবনেও।
সুন্দর বাংলোর ঘরে মানুষ এসেছে
একটি শিশুর হাতে পড়ে গেছে কুকুরের শিশু
যাবতীয়।
ভালবাসা আদরের দিন এসে গেছে !

আঙুলের রক্ত

ঘর শব্দটি কবিতার মধ্যে এলে আমি তার দরজা দেখতে পাই না
অথচ দরজা শব্দটির একদিকে ঘর, আর একদিকে বারান্দা
বারান্দার পাশেই নিম গাছ
আমার শৈশবের নিম গাছের স্মৃতির উপর বসে আছে একটা ইষ্টিকুটুম পাখি
যদিও ঐ পাখিটিকে আমি কখনো কবিতার খাঁচায় বসাইনি
শব্দের নিজস্ব ছবি তা শব্দেরই নিজস্ব ছবি
শরীরের ঘুম যেন মাটির প্রতিমার সর্বক্ষণ চেয়ে থাকা চোখ
যেমন পাথর ধুলো হয়ে যায়, কিন্তু জল বার.বার ফিরে আসে
কবিতায় কে যে কখন আসে জানি না
শুধু আমার আঙুল কেটে রক্ত পড়লে তা নিয়ে কবিতা লেখা হয় না।

স্টেস ১৭

স্বপ্নের জগতে আমার একটি সংসার আছে। গৃহকর্ত্রী সেখানে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। অনেকগুলি সন্তান সন্ততি। অভাবের সংসার। ছোট ছোট ঘর। পিঁড়ি ও মোড়া ছাড়া আসবাব নেই।

আমি বলি, তাড়া আছে, ওরা শুনতে চায় না শংকরপ্রসাদ। আমাকে ঘিরে ওরা গল্প জমিয়ে তোলে। চা আসে কানা-ভাঙ্গা প্লেটে, রোল্ড-গোল্ড রংএর ডিমভাজা আসে। যে সব রঙ্গ ও রসের কাহিনী উৎসাহের অভাবে কখনো বলতে পারি না, শংকরপ্রসাদ, সেগুলি বোকার মতো অনর্গল বলে যেতে থাকি।

লোকে হাসে। হাসতে হাসতে আমিও কামড় দিয়ে ফেলি ডিম-ভাজায়—আর অমনি পেছন থেকে গর্জন শুনতে পাই। সরিয়ে রাখি প্লেট, বলি খিদে নেই, পাছে ভেঙ্গে যায় স্বপ্নটা। ছেলে-পুলেরা কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দেয়। গৃহকর্ত্রী কাজের ফাঁকে ওদের—ভৎর্সনা করে। আমি আড়চোখে দেখি, বিছানায় ফর্শা চাদর পাতা হচ্ছে।

বাস্তব জগতে ছোটখাটো সংসার আমার। যেমনটি ফ্যাশান। সচ্ছল ও শান্ত। পরিজন প্রতিবেশী সকলেই বিবেচক ও প্রাপ্তবয়স্ক। ভোগ্যবস্তুর ঢের কিন্তু আমার অভিরুচি কম।

মায়ায় আবদ্ধ জীব আমরা, স্বাধীন ভ্রমণের সাহস নেই। অথচ শাস্ত্রে বলে, প্রেম থেকে হয় মুক্তির চেতনা। স্বপ্নের সংসারে এলে আমার অপরাধবোধ হয়। ওরা থেকে যেতে বলে। মোড়া থেকে উঠে পা ধুই, বিছানায় গিয়ে বসি। আরাম করে একটা সিগারেট ধরাই—আর অমনি কাশির দমক ওঠে, শংকরপ্রসাদ। পাছে অন্যদের ঘুম ভাঙ্গে, আমি দ্রুত বাথরুমে ঢুকে পড়ি। জল খাই, জলের ঝাপটা দিই, আর আয়নায় নিজের মুখে দেখতে পাই ভ্রমণের ক্লান্তি।

অপ্রস্তাবিত

অপ্রস্তাবিত অনেকগুলি থাকা, আমাদের অবসর
এখন সেই দিকেই এগোচ্ছে—যে-রকম কথা ছিল।
খুব শ্লথ এই ক্রমঅগ্রসর যেমন বিকেল পার হতে হতে
সন্ধ্যা হওয়া—বলার মতো কিছুই নয়, তবু
সেই অনতিশয় থাকাগুলি ভাবতেই হয় তাদের কথা।

এখন যখন সেইদিকেই যাওয়া। কতো বিচিত্র প্রস্তাব
পরিকল্পনা এবং বর্জন—সে এক কোলাহলের ব্যাপার।
আমরা কোলাহল পছন্দ করছি না আর। আমরা
কোনো রঙের ব্যাপারই ভাবছি না, শব্দের ব্যাপার
যা কিছু নিজেকে উচ্চারণ করে, দাবি জানায়।

অর্থাৎ প্রস্তাবিত উপস্থিতি—কেন মেনে নেব
ওদের আক্রমণ, আক্রমণ বলতেই তো বোঝায়
আঘাত রক্ত তলোয়ার! আমাদের ভিতরে ভিতরে
তাই এই যাওয়ার ছিল? যাওয়া যে ঠিক কোথায়
তাও তো বুঝতে পারছি না—খুব ঠাণ্ডা আর স্বচ্ছ আর কুয়াশা।

এ এমন একটা মেঘময় কিংবা দিনরাত্রিভর বৃষ্টি
কেউ প্রশ্নই করছে না কাউকে সবাই যাচ্ছে যেমন যাওয়া
যেমন আমরা এই এলাম—শাঁখ বাজছে না, উলু
দিচ্ছে না মেয়েরা—যা কিছু অপ্রস্তাবিত তাদের বসবাস
এতো ভয়াবহ প্রয়াসহীন! আমরা ভীষণ তাই চেয়েছিলুম?

রূপান্তর

শুধু প্রেমই তাকে ফেরাতে পারতো
তাই সে ফিরছে!
কালো সমাধানহীন কুয়াশায় ঢেকে ছিল পথ
শব্দের যে লোভ বহুদিন নরকে করেছে তাকে
স্বেচ্ছানিয়োজিত, তাও আর প্রণোদিত নেই!
ঘৃণাকে এড়িয়ে উঠা কিছু গান
নাগরিক বাতাসকে এখন কেবল করে
গ্রামীন বিব্রত—যে শোনে সে সরে যায় দূরে।

প্রেম তাকে ফিরিয়েছে? নাকি এতদিন পর
সেই আলিঙ্গন এনে আকুল খুঁজছে দুটি
কাঁকণের নিষ্ঠুর স্বীকৃতি ভরা স্বর্ণসম্পদ!
একটি গিয়েছে খোয়া শব্দের সন্ন্যাসে
বাকীটি এখন তার একমাত্র জীবনের সোনা
অস্তিম গ্রন্থের মতো যাকে হাতে নিয়ে মগ্ন মমতায়
বারবার দুঃখ পরীক্ষা করে!
জীবন ফুরিয়ে আসে, জীবন জুড়িয়ে আসে
অশ্রুকে যে কোনদিন ভাবেনি তরল
তাকে আজ চোখ মুছে ঘুম থেকে উঠে আলো খুঁজতে দেখি,
বয়সলাঠির মতো হাতে ধরা থাকে মূলক সন্তান
যেন বর্ণপরিচয়—বলে সূর্য শেখো
ছাখো কতদিন পর লাল হয়ে উঠছে
পৃথিবীর সনাতন দিক……

সকালের এক-আকাশ ছবিতে আলোতে
প্রজন্মের মুখ তখন শব্দহীন ঈশ্বরমুখর।

ছন্নছাড়া, এই বয়েসে

১

তোমার শিশুকে যেই উপহার দাও
খর স্রোতা নদীর ডাক নাম,
সে মুহূর্তে নদীটি শুকিয়ে গিয়ে
কাঁধে ব্যাগ নিয়ে
উঠে পড়ে নার্সারির গাঢ় নীল বাসে,
নুড়ির শব্দের পাশে জলস্রোত
জলস্রোত মুছে দিয়ে ঘোরতর নামতার সিঁড়ি
হারিয়ে গিয়েছে শূন্যে পাহাড়িয়া নদী
নদী ও শিশুর মুখ পরস্পরাহীন চিত্রে
ভেঙে সাতটুকরো করে বিবাহের পিঁড়ি।

২

কাছে দূরে লক্ষ লক্ষ ঘুমন্ত মানুষ আর মানুষের মাথা
শুয়ে শুয়ে গুণতে থাকি, অকারণ গোণা
আমাকে দেখেনি কেউ, জানেও না কিন্তু শুনি
গ্রামোফোনে পুরোন রেকর্ড যেন আমার গলায়
গান করে, সুরে ও বেসুরে, আমি এই অবেলায়
শিশুদের খেলার সোরগোলে মেতে, হাত তুলে বলি :
সূর্যতো এখনো জেগে, মাথার ভিতরে জেগে সমস্ত সন্তান
কাছে দূরে ঈশ্বর বিশ্বাসীরা গায় শ্রীকৃষ্ণের গান
ঐ অবধি, মৃতদেহে একটি ভ্রমর বসে' শব্দহীন
চিন্তিত উদাস।

আবিষ্কার

সাদা পালের যত নৌকা নেমে এসেছে উপসাগরের তুঁত-গলা জলে
সিন্ধুপাখি উড়ছে মাথার উপর
রোদ ফ'লে উঠেছে পত্রহরিতে
জাগলো একে-একে পাহাড়ের পিছনে পাহাড়
সব আধফোটা কুঁড়ি পাপড়ি মেলে বসন্তের শাখা-প্রশাখায়

শুধু কুয়াশা ঢেকে রাখলো দ্বারদেশের মহান সাঁকো
সোনার খনি নয়, আবিষ্কার করলাম তোমাকে আমি
যেখানে নুয়ে পড়েছে শুভ্র স্তবক
উপচে-ওঠা উৎসের ঠাণ্ডা বুকে

সমান সত্যি

আবার ঘনালো বাদল আবার যাবার মুখে
নাকি আমার হৃদয়ের বাষ্প ছেয়ে ফেলছে আকাশ
কিন্তু কোনো বিদ্যুদ্‌চমক নেই—নেই গুরু-গুরু বজ্রের ডাক
যেন এই ঘনিমার তলেই ছলছল করছে স্ফটিক-আলো
ঐ পারাবত উড়লো ঝিরিঝিরি বৃষ্টির ভেতর
আর নানান্ রঙের ছাতা গায়ে-গায়ে
এগিয়ে চলেছে ফুটপাথ দিয়ে

পশু-পাখিকে ভালোবাসে যে-মেয়েটি
ছড়িয়ে পড়লো তার হাসি

আমি এসেছিলাম আবার যেতে হবে
দুটোই সমান সত্যি

কবিরুল ইসলাম

তিনটি কবিতা

ছাতা

তুই তো ঠিকই লিখেছিস্ মা-বাবা ছাতার মতো কিংবা তারও বেশি
না, মেয়েদের চোখ-ধাঁধানো, রঙিন ফোল্ডিং ছাতা নয়
যাতে রৌদ্র সহজেই বিঁধে, জলে ব্রাহীন ব্লাউজ শৌখিনতা

যে-ছাতার কথা তুই লিখেছিস্ তা বরং
বিজ্ঞাপনের মস্ত ছাতার মতো সমস্তই ঢাকে
একদা ব্রাহ্ম মহিলার পোশাকের মতো
রৌদ্রে-জলে জলজ্যান্ত আড়াল বা রক্ষা করে সব সময়

বংশ পরম্পরা ॥

পূর্ণ অপূর্ণ

এমনি এলাম ঘটা করে, যদিও জানি চেনা বামুনের পৈতে লাগে না।

ঘটনা কিন্তু অন্যরকম : মনের কথা তাহলে মনেই থাক্
প্রথম বছর গাছের ফসল যেমন ঝরে যায়
এই এতোটা কাছের বিদেশ মঞ্জুভাষিনী
পীযূষ টানে তাই কি প্রত্যহ ?

কিন্তু জানো, প্রত্যহের অপূর্ণতা নেই
আমি তো জানি পূর্ণতার মানে ॥

রাত জেগে ওঠে

মাঝরাতে মানুষের কান্না শুনে ঘুম ভেঙে যায় :
একবার ভেঙে গেলে
এই ঘুম এ-মাঝ বয়সে আর জোড়া লাগে না
বস্তুত, বাজারে তেমন কোনো ফেভিকলও নেই।
বিছানার সে-টান আর নেই

সুতরাং উঠে পড়ি চোখ খুলে
চা বানাই দিনের প্রথম কাপ
বাসিমুখে সিগারেট খাই
নস্যে ও আলস্যে
বিস্কুটের টিন খুলি, ল্যাক্টোজেন দুধের বদলে,
হীটারও বন্ধ করে ঠিকঠাক

পড়ার টেবিলে বসি
রাত
জেগে
ওঠে ॥

অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রহান্তর

প্রতি দিন প্রতি রাতে শেষ হয়।
পৃথিবীর একই পরিচয় ;
নির্বীজ কুয়াশায়
ক্ষমাহীন ব্যাপ্ত রাত, অন্ধ জাগরণ।
যতই জানালা খোলো
নিয়ত শূণ্যতা হা হা করে
আত্মায়, শরীরে— চরাচরে।
প্রতিদিন ক্লান্তি আসে,
অথচ অক্লান্ত থেকে
মরুপথে ভারবাহী—
বালি ভেঙে দিনগত দীর্ঘ পাপক্ষয়।

পৃথিবী কি অন্য কোনো গ্রহের নরক ?

নিখিল ব্যানার্জির মুখ

রাত্রি যায় ব্রাহ্মমুহূর্তের দিকে।

ললিত রাগিনী বাজে হলে, চরাচরে, আমাদেরই প্রাত্যহিক বস্তুবিশ্ব জুড়ে।

ও কার ঘুমন্ত মুখ কোলে নিয়ে ব'সে আছো আজ ?
ওই নারীটির মুখে এ কোন্ তমসা ?
এই মাঘ, এই কুয়াশা-জড়িত রাত্রি শুনেছে আলাপ।
এরপর কথাবার্তা হবে ?
চারিদিক ঢেকেছে স্তব্ধতা। আমি এই তিমির-সীমান্ত থেকে
স্তব্ধতা কাটিয়ে উঠে দেখি :

নিখিল ব্যানার্জির মুখ ঢাকা আছে বিশাল সেতারে।

ক্ষমা করো ওকে

ক্ষমা করো, ওকে ক্ষমা করো।
জানি, পর্বতপ্রমাণ ওর অপরাধ, দণ্ডনীয়, তবু
নির্বোধ অসুস্থ জ্ঞান ক'রে ওকে এইযাত্রা ক্ষমা ক'রে দাও।
আসলে ও একদম জানে না
মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালবাসা, নিবিড় সম্পর্ক, আত্মীয়তা
বিস্তীর্ণ লতার মতো ধীরে ধীরে কতখানি সজ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠতে পারে।
ও বোঝেনা, নিতান্ত অবোধ, তাই যা কিছু সুন্দর গ্রহণীয়
তার মধ্যে আনে কালো একখণ্ড মেঘের মতো মালিন্যের ছায়া।
ওকে যারা খুব কাছে থেকে একটু একটু জানতে পেরেছে
তারা একথা বুঝেছে ও এই গ্রহের কেউ নয়,
ওর আচার আচরণ তাই ঠিক আর পাঁচজন সুস্থ মানুষের সঙ্গে একদম
মেলে না
ও আসলে একজন অস্পৃশ্যা নারী এখনো রয়েছে ঘোর অন্ধকারে, ওকে
আলোর সংস্পর্শে আসতে দাও
ওকে দুই পাহাড়ের মধ্যিখানে উদিত সূর্যের আলো দেখতে দাও, যাবতীয়
পরিপার্শ্ব
বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে দাও
সংঘাতের মধ্য দিয়ে ওর ভিতরে চৈতন্যের জাগরণ হোক।

অন্যগ্রহ থেকে ছিট্‌কে এই গ্রহে এসেছে তাই দয়া মায়া মমতা বা
আচরণবিধি ওর কিছু জানা নেই,
জন্তুর মতন তাই আঁচড়িয়ে কামড়িয়ে দেয়
যখন তখন, হাঁউ-মাউ ক'রে ওঠে, কথা বলে অর্বাচীন নরের ভাষায়
লম্বা ঢ্যাঙা কালো কুচকুচে হাত-পা-চক্ষু-নাক-কান বিশিষ্ট রক্তমাংসের
মানুষ।

ক্ষমা করো, ওকে ওর অন্দরমহল থেকে ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠতে দাও।

অশোক দত্তচৌধুরী

পড়ে আছে ওইখানে

পীচ ও সুরকীর থেকে দূরে এই মাটি,
খুব কাছাকাছি আসি।
জেব্রা ক্রসিং নেই, আজ কুয়াসায় ঢাকা দিন, ফোটে নুন জল।
দেখি, একা বারান্দায় তুমি,
তোমার নিজস্ব স্তম্ভ আছে, তাই লক্ষ্য ক'রে যাও অবয়ব,
কতটুকু কালো স্নায়ু, কোনখানে রৌদ্রের কপাল,
চকিতে কোথাও স্থির ফটোগ্রাফ,
যেন অনেক বছর কেটে যায়, দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি নিচে।
মনে হয়, একমাত্র তুমি বলে দিতে পারো,
গ্রহ, নক্ষত্রের শীত, ছাথা আরো কতদিন।

পীচ ও সুরকীর থেকে দূরে এই ১৯৮৪,
জানি, প'ড়ে আছে ওইখানে টুকরো-টুকরো কথা, অমোঘ নিয়তি।

একলা মানুষ

মেয়ের মুখের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে, উঠে আসে একলা মানুষ।
পনেরো বছর পর কোন্ রাত্রি কোন্ সকালের দিকে যাবে ?
তার কি কখনো মনে হবে, সেই একলা মানুষের কথা,
যে মুখ থুবড়ে প'ড়েছিলো বাথরুমে একদিন—
তারপর নিঃশব্দে চিতায় তুলে দেওয়া হ'য়েছিলো তাকে।

যার কথা আজ, ভুলে গিয়েছে সবাই।

অমিতাভ দাস

হাঁসজারুকথা

কারো কারো ইচ্ছে থাকে চল্লিশ বছর
ডালপালা হুয়ে পড়ে—হলুদ পাতা ঝরে—শুধু ইচ্ছেই থাকে
এক পাঠা, যার স্নান সেরে ভোরে কালীঘাটে
মানত হিসেবে মায়ের পায়ে উৎসর্গ হওয়ার কথা ছিলো
সে আজ "কমলাকান্তের দপ্তর"-এর নসী বাবুর বৈঠকখানায়
আলোচ্য বিষয় হয়ে

রবীন্দ্ররচনাবলীর ওপর ধূলোধূসর পাহাড় গড়ছেন

কেউ কেউ স্বপ্ন দেখেন চল্লিশ বছর
স্বপ্ন দেখা অপরাধ নয়—শুধু স্বপ্নই দেখেন
যে কখনো কোনকিছু স্বপ্ন দেখেনি সে সম্প্রতি
ভিক্ষের ঝুলি ছুঁড়ে ফেলে সিংহাসনে বসে
হাঁকডাক পাড়ে—শাসন করে পৃথিবী
স্বপ্নচারী মানুষ আচমকা জেগে উঠে কুর্ণিশ করে যান
অসম্ভব অলৌকিক ভেবে

কোন কোন কবি থাকেন চল্লিশ বছর
শুধু নির্জনতম কবির অহঙ্কারী মুকুট পরে থাকেন
যার নৃশংস আততায়ী হওয়ার কথা ছিলো
সে আজকাল নিয়মিত আমন্ত্রিত কবি-সম্মেলনে যান
কবিতা পাঠ করেন—হাততালি কুড়োন
আর কয়েকশ' কবিতার বই
কলকাতা বইমেলায় কয়েক মিনিটে
হট্‌কেকের মতো বিক্রি হয়ে যায়

সত্যিকার একজন কবি এমন দৃশ্যে
নিজের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়া আততায়ীর মতো
ভাগ্যের কাছে বধ্যভূমি ভিক্ষে চেয়ে বসে

বৃত্তান্ত : ভিক্ষুক

একটি ভিখিরীর পথের ওপর স্বাভাবিক কিংবা অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে
তদন্ত হয় না
সংকার সমিতি আসে না
হয়তো আততায়ী হাসিমুখে মাড়িয়ে যায়
হয়তো কারো না কারো উদ্দেশ্যে
অথবা জন্মকে ধিক্কার দিতে দিতে চলে যায়
নেংটো আত্মা বাউলের মতো মৃত্যুর একতারা বাজিয়ে

মৃত্যু ব্যাপারটা মানুষের কাছে এখন জল-ভাত
দমকল বাহিনীর মতো পড়িমরি পুলিশ-গাড়ী দৌড়ে আসে
কারণ মৃত ভিখিরীর ভিক্ষালব্ধ ট্যাকটির দাবীদার সরকার
মানে জাতীয় সম্পত্তি মানে আপামর জনসাধারণের মালিকানা

কেন মরলো-কিসে মরলো চেয়ারপন্থীদের মাথাব্যথা নেই
দ্রুত ব্যস্ততায় পরিপাটি সেজে ৫ তলা থেকে লিফ্‌টে নেমে
৫ তারা মার্কা হোটেলের বিশাল ভোজসভায়
উজ্জ্বল উপস্থিতি ঘটে

সাধারণ পথচারী থমকে দাঁড়িয়ে তার বুকের ওপর
নিরাকার আপ্লুত-সমবেদনায় কিছু সময় শোকাচ্ছন্ন থাকে
একজন সত্যিকার অর্থনীতিবিদ মৃতভিখিরীর উৎসে ঢুকে
'চরম মুদ্রাস্ফীতি—মানুষের সংকট ও সভ্যতার বিভ্রাট' নিয়ে
নির্মম থিসিস লিখতে লিখতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাগজকুচি
জানলা গলিয়ে নর্দমায় ফেলে দেয়
যেন যুদ্ধে হেরে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত-রক্তক্ষরণ নিয়ে
বসে থাকে পল্টনে

সে তা জানে না

যদিও আমার পায়ের নিচে সিমেন্টের মেঝে, যদিও
এখন এই দারুণ গ্রীষ্মে মাথার উপর পাখা
ইচ্ছে হলে ফ্রিজ খুলে ঠাণ্ডা জল, শীতে
পুলওভারের উষ্ণতা, ঠাণ্ডায়
কফি, এইসব—
আমার ইংগিতের প্রতীক্ষায়, তবু
ভুলতে পারছি না

আমি কি কোরে ভুলতে পারি, এইমাত্র
যে শিশুটি ফ্রি-বেডে জন্মালো, যে মেয়েটি
ছেঁড়া চটি ঘষটাতে ঘষটাতে ক্লান্ত নিঃস্ব পা
ফেলে ফেলে
চলেছে ডালহৌসির দিকে, তার
পা ডুবে যাচ্ছে চোরাবালির ঘূর্ণিতে

সে ভাবছে—একটা কিছু হবেই
দেয়ালে পিঠ ঠেকলে দেহ…
সে ভাবছে—মানুষ
শেষ পর্যন্ত জিতবেই, ভাবছে—
ঈশ্বর আছেন…জানছে না তার
পায়ের নিচে চোরাবালি, খাদ ; তাকে
তলিয়ে যেতে হবে

সোনালী চুলের দেবী উড়িয়ে দিলেন শ্বেত কপোত
শান্তি চাই, নাহলে
শীতের ন্যাড়া ডালপালায় ফল
ধরবে না ;
সোনার পাহাড়ে ধর্মবক,

জমেউঠছে হাড়ের স্তূপ, ইন্দ্রপ্রস্থের
অহংকার পড়ছে উপ্‌চে—
আমাদেরও !
ফ্রি-বেডে জন্মালো যে শিশু, মাথায় তার
মস্ত এক বোঝা,
ঠেলে তুলবে পাহাড় চূড়ায়, আবার গড়িয়ে
পড়বে ; সে তা
জানে না, তার—
পায়ের নীচে
চোরাবালি ক্রমশ বড়ো হচ্ছে,
হাঁ কোরে গিলতে আসছে, তা
সে জানে না।

রথীন্দ্র মজুমদার

এক জীবন

এই ভোরের বাতাসে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছো তুমি
উড়ো চুল দিগ্বিদিক শূন্যতায় ঢেকে নেয় তোমায়
নিদ্রাহীন আমি জানলায় তাকিয়ে কতকাল
ভোরের বাতাস ভাসিয়ে দিই আমার নষ্ট পঙ্‌ক্তিগুলি
শরীরের ফাটা বীজ আমি ঘ্রাণ পাই অসীম বৃক্ষের
নারী, শীত আসছে, চলো, শস্য ছড়ানো মাঠে, চলো যাই
সেতু বেঁধে দেবো আমরা, সারা মাঠ জুড়ে কার কান্নার শব্দ
শুকনো ত্বক, এই দুই হাত, ভেজ শরীর, ফিরে আসছে
হারানো স্বপ্ন, টসটসে আঙুর, বেদনার ভারে নুয়ে-পড়া লতা
ধুলোয় ধুলোয় বহু দূর যেতে হবে আমাদের এক জীবনের ওপার।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

আয়না

১

অনেকদিন পর
আবার সময় হ'লো
অনেকদিন পর আবার
সময় হ'লো
আয়নার সামনে
দাঁড়াবার,
সময় হ'লো
আয়নার ভেতর
ঢুকে পড়বার।
এখন আমি সুখী।
সুখের জন্য,
সুখের জন্য কত কি
করতে হয়েছিলো আমাকে—
লিখতে হয়েছিল পদ্য
করতে হয়েছিল সিনেমা
হতে হয়েছিল
হাসি মুখের গম্ভীর মানুষ।
এখন পদ্য
পদ্যকে গিলে খাচ্ছে
এখন সিনেমা
সিনেমাকে গিলে খাচ্ছে
এখন
কিছুই থাকবে না জেনে
নিরুপম বাবু
কাগজ কিনে উঠে পড়ছেন

দীঘা যাবার বাসে
নিরিবিলিতে পুজোর
সাতসতেরো
লেখার দাবী মানতে।
এখন
এক বছরের মেয়ে
গোল গোল চোখ ক'রে
তাকাচ্ছে
তার নিজের ক'রে পাওয়া
ছোট আয়নার দিকে
যার মধ্যে দিয়ে
তার উদ্‌ভুতুড়ে বাবা
হেঁটে চলেছে
ছুটে চলেছে
উড়ে চলেছে
আয়নাময় দেশে।

২

এসো,
ঢুকে পড়ো তোমরাও।
দাঁড়িয়ে আছো কেন?
কিসের ভয়?
আমার এই আয়নার জগৎ
তোমাদের
খাট-বিছানা-বালিশের চেয়ে
কোন অংশে
খারাপ নয়।
এখানেই দেখা হ'লো
তোমার বাবার সঙ্গে,
তোমার বাবার

বাবার সঙ্গে,
তোমার কথা
তোমার দু-মেয়ের কথা
বলতে বলতে
চোখ দিয়ে
জল বেরিয়ে আসছিল
তোমার বাবার।
কেমন চলেছে ফ্রীজ?
কেমন চলছে গাড়ি?
কেমন চলছে টেলিভিসন?
তোমরা কি
এখনো ব্যবহার করছো
খাবার টেবিলে
ছবির মতো রাখা
কাঁচের বাসনপত্র?
তুমি কি কেটে রেখেছিলে?
কেটে রেখেছিলে তো
কাগজের এক কোণের
সেই খবর—?
আমার সেই
আয়নার ভেতর
ঢুকে পড়ার
উড়ে চলার
ঘুরে চলার খবর?
কেটে রেখেছিলে তো?

৩

কাল রাত্রে
ঘুম থেকে উঠে
আয়নার ভেতর

প্রকাণ্ড এক চিড় দেখে
অবাক হয়েছিলে তুমি।
যখন
ঘুমিয়ে ছিলে
আয়নার ভেতর থেকে
বেরিয়ে আসার ইচ্ছে
আবার
পেয়ে বসেছিলো
আমাকে।
দু-হাত দিয়ে
ঠেলতে শুরু করেছিলাম
চারপাশের আয়না।
মাঝে মাঝে
এখনো
আগের মতো হয়,
গরম হয়ে যায়
মাথা,
গরম হয়ে যায়
শরীর,
টগবগ ক'রে
ফুটতে থাকে
রক্ত,
দাঁত
কিড়মিড় ক'রে
মুখের ভেতর থেকে
বেরিয়ে আসে
শব্দ।
আমি বলতে চাই—
ফিরিয়ে দাও

পদ্মের খাতা,
এখনো অনেক পদ্ম
বাকি আছে,
ফিরিয়ে দাও
ক্যামেরা,
বাকি আছে
এখনো অনেক ছবি
তুলবার,
আবার
আবার হেসে
গম্ভীর ভাবে
তাকিয়ে থাকতে দাও
নিউজ প্রিন্টের
খর খর পাতার ওপর।
অদ্ভুত এক নেশায়
পাগলের মতো
আমি ঠক্ ঠক্ ক'রে
মাথা ঠুকি আয়নায়।
কাল
এমন একটা মুহূর্তেই
খচ্ ক'রে
আলো জ্বালালে তুমি,
মশারি থেকে নেমে
জল খেলে,
ঘুমের মধ্যে
কেঁদে উঠলো বাচ্চা
চিৎকার করে উঠলো
বড়ো মেয়ে,
আর

তুমি
অবাক হ'য়ে
অবাক অবাক হ'য়ে
তাকিয়ে থাকলে
চিত্ত ধরা
আয়নার দিকে।

সুভদ্রা ভট্টাচার্য

অনুভূতি

খোড়ানো সিঁড়িতে পা দিতেই উনি চ'মকে উঠলেন
হাতের তালুতে রাখা জগৎ
আর… … … …,
ভয়ঙ্কর একটা উৎসব হ'য়ে গেলো
এই আর কি … … । বলবার মতো নয়
হারানো মাফলার—আর সবুজ রুমাল
কে কোথায়, কেউ জানে না।

অনুভূতিতে অবিরাম একটা বৃষ্টির শব্দ
টুপটাপ……, টুপটাপ… …।

ভাস্কর চক্রবর্তী

স্রোত

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত একা ছেলেটি শুধুই বসে আনে আর মুছে দিতে চায় সব
ভৌতিকব্যামেলা

যে জল ছলকায় দূরে তবু তা আবার ফিরে আসে।

মেয়েটি দোকানে ঘুরে কিনে আনে লবঙ্গ, টেবিলঢাকনা, বই—
মেয়েটি দোকানে ঘুরে কিনে আনে ঘর সাজাবার মতো মিষ্টি সরঞ্জাম।

এসেছে অকালবৃষ্টি এসেছে বাঁধনহারা স্বস্তিছাড়া গুপ্ত কালোমেঘ
মাথা ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে ছেলেটির?—মেয়েটি এখনো শান্ত?—অশান্ত কি?

ছেলেটি হঠাৎ উঠে টেনে চেপে বসে আর কাছে গিয়ে মেয়েটিকে দু'হাতে
অভ্যাস

যে জল ছলকায় দূরে তবু তা আবার ফিরে আসে।

সুব্রত রুদ্র

হওয়া

বিবাহ হ'লো বিচ্ছেদ হ'লো না
বন্ধন হ'লো প্রেম হ'লো না
সন্ততি হ'লো সুখ হ'লো না
মান হ'লো গান হ'লো না

মৃত্যু হ'লো অন্ত হ'লো না

রাণা চট্টোপাধ্যায়

দার্জিলিং-এ বৃষ্টি এলো মে মাসে

এবার দার্জিলিং-এ বৃষ্টি হলো মে মাসে, জীপের ভেতর
কনকনে বাতাস, নিচে রডোডেনড্রন গুচ্ছ ও মানুষের ঘরবাড়ী
পথ ভেঙে উঠছিল থেলনা রেল।
ম্যালে ফেরার সময় একটা বুড়ো বেতো ঘোড়া দেখলাম ধুঁকছে
সারসার বেঞ্চিতে নিচে থেকে উঠে আসা প্রথম দেখা অভিভূত স্বামী-স্ত্রী
যুবক যুবতী ও উলের বলের মত কচি শরীরের মেলা
সার সার বসে আছে মহাকালের মন্দিরের দিকে পিছন ফিরে
আমি চোখের ক্যামেরায় তুলে রাখলাম পাহাড় বন্দী মানুষের ছবি

এবার দার্জিলিং-এ বৃষ্টি হলো মে মাসে, তুমি তখন কলকাতায়
বেগুনীরঙের রোদ চশমায় দেখছো মেঘের আনাগোনা
আর আমি নেপালী মেয়েদের খাবরা ফরসা মুখ দেখতে দেখতে ক্লান্ত
দেখছি পেছনের সারিবদ্ধ পাহাড়ে স্তূপস্তূপ মেঘ করেছে
লাল সোয়েটার পড়া জিপসীরা চলেছে পাহাড় ভেঙে ভেঙে
গুম পাহাড়ের দিকে, তিনধরিয়ার দিকে, কার্সিয়াং-এর দিকে
এই সময় হাওয়া উঠলো জোরো, ট্যাক্সির মাথায় চাপানো ভারি
স্যুটকেশে জল পড়ছে, জল পড়ছে হাসিমুখী নেপালী রমনীর স্তনে
আমার সোয়েটারে শিকদার বাবুর মাফলারে—

এই সময় আমার মন খারাপ করলো বর্ষাকালীন ভেজা মনখারাপ
অসীম স্তব্ধতার ভেতর পাইন গাছের বনের ভেতর সিনকোনা গাছের গন্ধে
অসম্ভব সুন্দর এই গিরি কন্দরে।
এই সময় আমার ব্যক্তিগত সুখ ও দুঃখের কাছে আমি
ঋণী হয়ে রইলাম, আমি ঋণী হয়ে রইলাম "লাভারসমিট'
তিস্তা তরঙ্গিত মানুষের জন্য রেখে যাক শব্দস্রোত
আর দূরে আমাদের রাত্রিবাস রাত্রিকালীন নিরাপত্তা
আমাদের মনের ভেতর একধরণের তৃপ্তি এনে দিলো

যে রকম তৃপ্তি তুমি প্রথম পেয়েছিলে মা'র বুকের ভেতর লুকিয়ে
হাজার বছর আগের কোন হারানো শৈশবকালে

এবার দার্জিলিং-এ বৃষ্টি হ'লো মে মাসে
এবার দার্জিলিং-এ বৃষ্টি এলো রাত্রিবাসে।

তুলসী মুখোপাধ্যায়

পিপাসা সংক্রান্ত

পিপাসা কি নির্বাসনে আছে ?
কে সে কেমন রাজা—
আমার প্রভুকে এই দণ্ড দিয়েছে ?
মৃগতৃষ্ণার বিকল্প শুধু আত্মঘাতী মলিন গরল !
পিপাসাকে নির্বাসন কোথায় দিয়েছ ?

আজকাল পিপাসার পদচিহ্ন কোথাও দেখিনা
সুন্দরী রমণী আর মশাল জ্বালে না।
নিশান নাড়ে না আর ফুলের বাগান
লাখ লাখ পদাতিক মৃত মনে হয়।
কেবল —
পিপাসার জন্য পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়
অথচ কে না জানে
কেবল পিপাসা ছাড়া পিপাসার বিকল্প কিছু নাই।

হে রাজা, হে গাড়ল দণ্ডবিধাতা —
পিপাসাকে কেন নির্বাসন দণ্ড দিয়েছ ?
কোথায় দিয়েছ ?

শীর্ষেন্দু চক্রবর্ত্তী

হরবোলা

শব্দের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাও
খোপে-খোপে হাই-রাইজ, লবি, সিঁড়ি, দোতালা-তেতলা…
প্রতিটি খোপের মুখে, প্রতিটি তলার বাঁকে
পাল্টে নিও আলজিভে মূর্ধায়
ধ্বনির টাকনা, নাকি বর্ণপরিচয়।
প্রতিটি বাঁকের মুখে অঢেল ছড়ানো মুখ, ঠোঁট নড়ে
পাতলা পুরু ফ্যাকাশে রক্তিম ঠোঁটে আটকে থাকে
বুক ঠেলে উঠে-আসা শব্দের সততা,
অচেনা ধ্বনির ভিড়ে প্রতিহত, ক্ষয়ে আসা প্রতিধ্বনি
ফিরে যায় ঠোঁটে, বুকে পৌছাতে পারে না।
বর্ণপরিচয়, ধ্বনি, যা কিনা ছুঁইয়ে দেয় জিহ্বামূলে
বীজমন্ত্র, উচ্চারণে ধীরে ধীরে আদিগন্ত নীলজলে
ভেসে ওঠে মানচিত্র, তটরেখা অন্তরীপ কূল উপকূল

এ-বাড়িতে খোপ থেকে লবিতে-সিঁড়িতে ঘোরে শব্দভ্রমি,
প্রতি ধাপে জিহ্বামূলে পাল্টে যায় ধ্বনির আস্বাদ, তাই
ভুলে যাই বীজমন্ত্র, উচ্চারণে নীলজলে জাগেনা ভূগোল ;
বুক ঠেলে উঠে-আসা যা-কিছু, পারি না তাকে শব্দে চিনে নিতে,
অথচ ধ্বনির ভিড়ে
হরবোলা সেজে পারি অনায়াস আলাপচারিতা।

অভী সেনগুপ্ত

যেভাবে রাত্রিতে, গোপনে

চামড়ার ভিতর অশরীরীদের অগ্ন্যুৎপাত, রোমকূপের ঝাঁঝরিগুলো দিয়ে এক জীবন জল ঢেলে দেওয়ার পরিশ্রম আমার ঐ আগুনে—বিনিময়ে অন্তর্জগৎ তোলপাড় আর বাইরে যা-কিছু ধোঁয়াটে ব্যবহার। মাঝেমধ্যেই পঙ্গু ভাষা চ'লে যায় তোমাদের কানের নতি আলতো-ক'রে ছুঁয়ে থাকতে যে ভাবে রাত্রিতে, গোপনে বিষ্ণুকের ডালা-খোলার ফিস্‌ফিস্ এক-চিমটে বাতাসে হারায়—শোনো আমি এই রকম—হে সরল অনভিজ্ঞ মানুষ। ভরদুপুরে এক পাথুরে উপত্যকায় পত্রহীন বিশাল গাছের মধ্যবর্তী কেদারায় আমার বাঁশি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দেখেছি স্বপ্নের সারবন্দী কামরাগুলো চলে যাচ্ছে প্রতিটি এক কিন্তু একাকী। অতিকায় ঈগলেরা এসে ঠাণ্ডা মাথায় সেসময় ফেলে দিচ্ছিল মেধাসর্বস্ব শয়তানদের। হে সরল অনভিজ্ঞ মানুষ—শয়তানদের ক্ষমতা ও কেচ্ছা আমার দিকে তাক ক'রে আমার রৌদ্রমাখা শৈশব প্রথম পাপের মতন ব্রাহ্ম মুহূর্ত-কে সাবলীল ঈগলেরা গম্ভীর, রোমশ ডানায় তুলে নিয়েছিল। ওরা কেন নিয়েছে বাঁশি—আমার সর্বস্ব—জীবনের সবকটি ফুৎকার ? তুলোটে মেঘগুলি, অশ্রুসজলতা এই শরীরে আর ফিরে আসে নি—দু'চোখ অশ্রুবিমুখ কতকাল। বলো, কীভাবে আসে অজ্ঞাতবাস, কোথায় বা সেই অজ্ঞাতবাসের আদৎ গাছ যার আকাশ লোভী ডালপালায় অতীতকে গোপন-গচ্ছিত রেখে স্বাভাবিকতায় মিশে থাকা যায়।

একটি সাহস একটি সরলরেখা

এই হাত ছুঁয়েছে তোমাকে। সেই অবধি তুমি দূরান্তরের যাত্রী, ভেবেছো—পাপের বিকল্প কী এই হাত? তুমি জানোনা, জানে না এই হাতও শুধু আমাদের গোপনে কোথাও কাঠচেরাই-এর একটানা শব্দে বনদেবী উশ্‌খুশ ক'রে ওঠেন ক্রমশ, নিয়ম বহির্ভূত শব্দ ক'রে বনান্তরালে ছুটে যায় হরিণের সমারোহ, মৃত্যু-খর খর পাতাগুলি ঝরতে-ঝরতেও মুহূর্তের স্তব্ধতা পায় শূন্যে

আর দক্ষিণ সমুদ্রে একটি ঢেউ উত্তাল হয়ে যায় হঠাৎ-ই যার আওতার মধ্যে যেন এক ক্যাটামারানে ব'সে তুমি দিগন্ত কিম্বা শতাব্দীকে গান শুনিয়ে বর্ষণ মুখর ক'রে দিতে চাও। বারবার নয় কেবলই একবার তোমার গানের তন্তুজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, স্বরনিক্ষেপে যেন গ্রহান্তরের বাতাস এসে ছোবল দেয়—এই হাত তবে ছিলো সেই বাতাস হুবহু। ঐ ক্ষণজীবী, সাহসী ঢেউ এর উত্তাল তোমাকে বিবশ ক'রে দেয়, সে কি সেই উপলব্ধি যা তোমাকে জানিয়েছে—দিগন্ত নয়, শতাব্দী নয় জীবন নয়,—একটি হাতই সরাসরি ছুঁয়ে দেয় সর্বস্ব। তুমি যতদূর যাবে তোমার অভিজ্ঞতার বৃত্তগুলিকে একটি সাহস, একটি সরলরেখার মতনই ভেঙ্গে দোবো ধরে থাকবো আমি—আমার এই হাত।

পঞ্চানন মালাকার

সুখের জানালা

সুখের জানালা থেকে দেবদারু ছায়াদের রাতে
আকাশের তারা গোনা ভালো।
কেননা আকাশ স্থির অফুরন্ত তারার শরীরে।

সুখের জানালা থেকে সবকিছু দেখে নেওয়া ভালো।
কাছের অরণ্য কিম্বা সুদূরের সামুদ্রিক হাওয়া
বলে দেবে ভালো আছি, বলে দেবে তুমি ভালো থেকো।

সুখের জানালা থেকে যত খুশি ওড়াতে পারো আজ—
ওড়াও স্বপ্নের পাখি, দুঃখ যেন ওদের না ছোঁয়।
সুখের জানালা ভালো, সুখের জানালা খোলা রাখো।

মৃত্যুমুখ

তোমার মৃত্যুর মুখ একবার তুলে ধরেছিলে
গাছের পিছন থেকে জানালার ওপারে আমার
কয়েক মুহূর্ত পরে কিছু নেই, শুধু নীল প্রান্তরে কুয়াশা···
আমি কাকে ডাকি আজ? কাকে বলি একদিন যত আচ্ছন্নতা
রচনা করেছ তুমি আজ এসে সেইসব কুহেলী সম্পূর্ণ করে যাও
কোথাও বাঁশরী বাজে, তবু তুমি কুঞ্জবন ছেড়ে গিয়েছিলে
কে আর খেলবে হোলি? কে আর ছড়াবে ফাগ, যমুনার ধারে!
পায়ের নূপুর খুলে রেখে দেয় সমস্ত গোপিনী
যদি কোনো শব্দ ওঠে, যদি শুনতে পায় ননদিনী!
শয্যায় পেয়েছ তাকে একরাত্রে। তার ওষ্ঠ চুম্বনের কালে
দেখেছ সে পতি নয় মাতা নয় কন্যা নয় পিতা নয় কারো
বিশাল বাষ্পের মতো সে একাকী উঠে যায় শূন্যের চূড়ায়
মুখের গহ্বর থেকে প্রতি পলে ঝলকে ঝলকে
উদ্গীরন করে আলো, অতিকায় গ্যাসে পিণ্ডময় নীহারিকা
তোমার জরায়ু ছেঁড়া ওই শিশু, তোমার শিশুর পিতা ও-ই
তুমি যেন স্বপ্নে ছাখো জল ভেদ করে ওঠে কালীয় নাগের দীর্ঘ ফণা
তার ওপর বংশীধারী নৃত্যরত রয়েছেন—কবে যেন এই নিধুবন
ত্যাগ করে গিয়েছেন গুনধাম তবু আজো তাঁর
অলক্ষ্য বাঁশীর ধ্বনি জেগে ওঠে কোথায় শূন্যের অন্তরালে
যেখানে পৌছয় না শব্দ, যেখানে পৌছায় না আলো, যেখানে বেতার
তরঙ্গ পৌছয় না শুধু বিকিরণ হারানো তারকা
কালো গহ্বরের মতো জেগে আছে, তিনি তার ভূমিতে পা রেখে
মুহূর্তে জাগান ধ্বনি মুহূর্তে জাগান আলো মুহূর্তে জাগিয়ে দেন মেঘ ও বাতাস
তোমারও শরীর তেমনি ঋতবান করে তুলেছেন একদিন
তুমি কি কৃতজ্ঞ নও? বলো হে পুরুষ বলো হে রমনী
বলো হে পতঙ্গ বলো কীট

তুমি কি সত্যিই চাওনা হঠাৎ ঝলক এসে একবার দেখাক তোমার
জন্মের মুহূর্ত, ক্ষিতি, মৃত্যুর মুহূর্ত, ব্যোম, শৃঙ্গার মুহূর্ত, অগ্নি, শিব!
পিঙ্গল জটার মধ্যে দুলছে অজস্র সাপ—পৃথিবীর সব পুরনারী
চলেছে মূর্ছার ঘোরে মূর্ছায় মিলিয়ে যাচ্ছে জটার ভেতরে গঙ্গাধারা···
তারাই গোপিনী দল, তারা মেঘ, আর সেই মেঘ ভেঙ্গে ভেঙ্গে
আজ রাত্রে বৃষ্টি এলো, ঢেকে গেল দূরের জঙ্গল
আর এই বৃষ্টির রাত্রে পৃথিবীর প্রান্ত থেকে আমি একা আমার মৃত্যুর
স্নিগ্ধ মুখ তুলে ধরি গাছের পিছন থেকে জানালার ওপারে তোমার···

তপন ভট্টাচার্য

ডিসেম্বরের গান

তুমি পছন্দ করেছিলে লাল টালি দিয়ে ছাওয়া ঘর
আর যেন কাচের সাসি ঘিরে জমে থাকে মেঘ।
গত ডিসেম্বরেও আমরা নীচে নেমে যাইনি কখনো—
চা বাগান ঢেকেছিলো ইঞ্চিপুরু তুষার চাদরে।
ভেবে ছাখো, অতটা হিমের দিনে যারা এসে খুন করে গেল
তোমাদের বাগানের সেরা মেয়ে রত্নার রুগ্ন স্বামীকে।
লালরং তোমারই ছিল, পোষাকে ও জানালার রঙে
চেয়েছিলে মেঝেটাও লাল হোক, তাই আজ মাঝ ডিসেম্বরে
তোমার কামীন বন্ধু চিরে দিয়ে গেল এই কঙ্কাল বুক!
ওই ছাখো মেঘ চিরে লাল সূর্য তোমাকেই বাহবা জানালো;
রত্না—তুমি এই টিলা, টালিঘর, এই মেঘ ছেড়ে
কখনো যেওনা যেন কোনো শীতে আরও নীচে নেমে।

সুজিত সরকার

চিরকালীন

জল আর আগুনের পাশাপাশি
জেগে আছে শরীরে শরীর,
তৃষ্ণা ও উষ্ণতা।

একদিন মুছে যাবে সব।
জল আর আগুনের অন্তিম নিবিড় স্পর্শে
থাকবে না কোনকিছু—
তৃষ্ণা, উষ্ণতা, শরীর।

শুধু থেকে যাবে আলো, অন্ধকার, চিরদিনের আকাশ।

বিংশ শতাব্দীর শেষে

প্রচারিত হ'তে হ'তে মিথ্যে অবশেষে সত্যি ব'লে প্রমাণিত হয়,
উজ্জ্বল পোশাকে ঢাকা পড়ে ভয়ংকর নগ্নতা,
রাজনীতি মানুষকে ক'রে তোলে মানুষের শিকার,
বাড়তে থাকে পাগল, ভিখিরী, শিক্ষিত বেকার ও দুষ্কৃতকারী,
বাড়তে থাকে মেডিক্যাল স্টোর্স, যাত্রা-অনুষ্ঠান, লটারীর খেলা—

বিংশ শতাব্দী ধীরে ধীরে শেষ হ'য়ে আসে।

হারমোনিয়াম

অন্ধ গায়িকার সাথে ট্রেনে উঠে আসে তরুণ গায়ক
গলায় হারমোনিয়াম ঝোলে আর এককামরা
বিরক্ত মানুষ নিয়ে ছুটে চলে বাষ্পযান
আপাতত করার কিছুই নেই, ঘণ্টা দুয়েক শুধু নিজস্ব জায়গায়
বসে থাকা ছাড়া, এইই কাজ
কেমন অপরিচিত মানুষের সান্নিধ্যে অভ্যস্ত মানুষ
ভাঁজকরা খবরের কাগজ হাত বদল করে নেয়
আর হঠাৎ কেঁদে ওঠে একশিশু, আর তখনি কেউ খেয়াল করেন
জয়নগরের মোয়া ওঠেনি এ-কামরায়
কেমন ঘর সংসারের গন্ধ ভেসে আসে আচমকা
শুধু স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমনের স্বাদ পাওয়া যায় না
এ পথে
অন্যথায় বেশ লাগে
তরুণ গায়কের আঙুল খেলা করে হারমোনিয়ামের উপর
আর অন্ধ গায়িকা তার প্রসারিত হাতে কি যে চায়
কেন যে ওমন অদ্ভুত হাসি লেগে থাকে ঠোঁটে
ঠোঁটের ওপর কালো তিল হাসে
মেয়েটি কি জানে
কেউ কি বলেছে তাকে, তরুণ গায়ক তুমিও কি বলোনি কখনো
অথবা খেয়ালই করোনি
ঐ তুচ্ছ তিল, হায়রে, দ্রুত ট্রেণ ছুটে যায়
আর বিরক্ত মানুষেরা চুপচাপ বসে থেকে শোনে
হারমোনিয়াম বাজে
তরুণ গায়ক, তুমি তো জানো সামনের স্টেশনে বড়ো ভিড় হয়
অন্ধ সঙ্গিনীকে তাই সাবধানে নামিও ॥

ঘরে ফেরা

তার যাবার কথা ছিল মাটি ও আকাশ যেখানে হাতে হাত
রেখে চুপ দাঁড়িয়ে থাকে তারই কাছাকাছি অর্থাৎ ততোদূর
যতোদূর গেলে আর ফেরার ইচ্ছে থাকেনা
ঠিক সের'ম দূরত্বে
অথচ গতকাল তার কি যে হলো
ভীষণ ঘরে ফেরার ইচ্ছেয় সে ভাবলো, যাবে না
এদিকে কোথাও না গেলে ফেরা যায় কি ভাবে এমন ভাবনায়
তার ঘুম হলো না সারারাত্তির
সকাল বেলায় সে নেই দূরত্বের সন্ধানে বার হলো
যেখান থেকে মনে হবে
মাটি ও আকাশ হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে
তারই ঘরের কাছাকাছি ॥

অরুণ বসু

ব্যাঘ্রপ্রকল্পের বন

বাঘ, মেয়েমানুষের সাথে আমি এ-অরণ্যে, বহুদূর, হেঁটে যেতে চাই
যেতে যেতে, আত্মার ভিতরে বিষ, শাখামুঠিসাপ ও শামুক
আমাদের পরম-আদরে ধ'রে সমুদ্রবিভায় যেন গিলে চাই খেতে
তবুও রহস্যময় নারী ও প্রজন্মে বোনা, এখনো যেটুকু আছে সামান্য-
আকাশ
ঝড় এসে তাকেও গুঁড়িয়ে যায়, এই একা বনরেখা আর শোয়া-কাশ
নুয়ে আছে হাতের নাগালে ভাঙ, সজনেখালি এবং হা-মুখ
শ্রমজঙ্গলের কটি, সবুজ করোটি ভেঙে, ব্যাঘ্রপ্রকল্পের বন দিগন্তরেখায়
মানুষকে কাছে ডাকে, ডেকে এনে, মানুষী ও শুক্রতাকে তীব্র ক'রে খায়

চাকা—১

বাসের ক্ষুধার্ত্তক্ষিপ্র জানালাটি ছুটে গেলো।

গাছপালা, ওরাও ছুটলো, দেখলাম। দেখেনিতো অনেকেই,
অন্ধ পুলিশম্যান দেখেছে গাছেরা চুপ, শান্তহিম, ধ্রুব।

অবশেষে জানলাম গাছকে ছোটাতে পারি।
আজ সকালের বাসে, জানালার সীটে, আমি একটি চিতা,
ছিপি খুলে দিয়েছি দৃশ্যের। আর, গলগলিয়ে
বেরিয়ে আসছে ঐ দৃশ্যকোলাহল।

জানালা চলেছে, খুবই লাফিয়ে লাফিয়ে, দ্রুত,
চিরশিকারের খোঁজে।

চাকা—২

সন্ধ্যাকালীন বন্ধুরা আনে তেতো রাত্রির প্রস্তাব।
মাথা গুঁজে দেয় কালো তামাকের ভেতরে।

আমার, অথচ, নাচ-বাজনার বাতিক।
সারারাত ট্রেণ চলে। আর, দেখি ফেরিওলারাও অনিঃশেষ

আলোবাজনার মধ্যে তোমরা ঘুমিয়ে পড়েছো?

একটি পালক খসছে? সন্ধ্যায়?

সে-তো তোমাদের বিষয়, প্রবল শিস্ দিতে দিতে
আমি ছুটে যাই, খুব দ্রুত, আমি আজ সন্ধ্যার ট্রেণ…

দেবাশিস তরফদার-এর আপেলের বিকল্প

কেউ কেউ টয়গান দিয়ে
পায়রা মহলে খুব চঞ্চলতা সৃষ্টি করে।
তবুও ভাষার কিছু বাকি থেকে যায়।

ওপরের লাইন তিনটি যে কবিতার থেকে নেওয়া, তার নাম 'ভাষা'। কবির নাম দেবাশিস তরফদার। এঁর কবিতা আগে কখনো পড়েছি বলে মনে পড়ে না। পত্রপত্রিকায় অনেক লিখে পরিচিত হবার আগেই তিনি ২৪ পৃষ্ঠার রোগা কিন্তু ঝকঝকে চেহারার বইটি নিয়ে বাংলা কবিতার কলমন্ত্রিত রাজ্যে প্রবেশ করলেন। আলোচ্য বইটিতে মোট কবিতা আছে উনিশটি। কিন্তু এই বাহুল্যবর্জিত সংকলনের কবিতাগুলোতে দেবাশিস আমাদের মনের কল্পনাকে আর একবার উশ্‌কে দিয়েছেন নতুন করে, এজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

কবিতাগুলো পড়তে গিয়ে প্রথমেই যেটা নজরে পড়ে তা হলো কবিতাগুলোর মাস-বছর সূচক শিরোনাম। উনিশটির মধ্যে চোদ্দটি কবিতাই কোনো বিশেষ মাস ও বছরের নামাঙ্কিত। সবচেয়ে পুরনো 'জুন ১৯৭৯' এবং সবচেয়ে সাম্প্রতিক 'এপ্রিল ১৯৮৩। তবে এগুলি ঠিক জার্নালধর্মী নয়, বিশেষ কোনো বহির্ঘটনার দলিল নয় এরা। বরং এদের বেশির ভাগই সূক্ষ্ম রেখায় আঁকা মিনিয়েচার ছবির মতো। হ্যাঁ, ছবির কথাই বেশি করে মনে পড়ে। এবং সে ছবি মূলত স্থানচিত্র, নিসর্গচিত্র। দেবাশিসের কবিতায় বক্তব্য বলে প্রায় কিছু নেই, চৈতন্যের তেমন কোনো জটিল সংঘাত প্রকাশ পায় নি। কিন্তু ছবি আঁকার অসামান্য গুণটি সহজেই আয়ত্ত করেছেন তিনি।

হালকা রেশমকোমল ভাষায় চারপাশের পৃথিবীর নিসর্গপটটি যেভাবে তিনি খুলে ধরেন, তা আকর্ষণীয়। সূর্য, সকাল, রোদেভরা দিন তাঁর আঁকা ভাষাচিত্রের একটা বড়ো প্রসঙ্গ। যেমন :

'শাদাফ্রকপরা একটি দিন' (পৃ. ৪)
'এবাড়ির গাছ থেকে ওবাড়ির গাছে
রৌদ্রসেতুবন্ধন হলো।' (পৃ.১০)

'গাছ বাড়ে স্বর্ণরসে কমলাকোয়া ফেটে…' (পৃ. ১২)
'সামান্য রোদের রসে উজ্জ্বল হয়েছে রূপাড়া' (পৃ. ৮)
'ডুবে আছি রৌদ্রহ্রদে' (পৃ. ১৩)
'পৃথিবী হঠাৎ যেন শতশত ক্রীসমাস্ কার্ড' (পৃ. ৬)

একদিকে এই আলো উজ্জীবন সোনালি তারুণ্য, অন্যদিকে এক অনিবার্য বিপন্নতাবোধ ক্লান্তি ও শূন্যতা ভর করে আসে দেবাশিসের কবিতায়। তখন তাঁর মনে হয়:

'একদিকে মনিং স্কুল
অন্যদিকে ভয়ংকর জেল…' (পৃ. ৩)
'কালো ক্যাপস্থলের রক্ত ফিরে এলো ঠোঁটে' (পৃ. ৬)
'অন্য একটি একা সূর্য রূপডানা, ক্রমশই ঝুলে পড়তে থাকে'
(পৃ. ২৩)

শব্দপ্রয়োগে বিশেষত বিশেষণ প্রয়োগে এই কবির নিজস্বতা আমাদের ভালো লেগেছে। যখন তিনি বলেন 'মাদুরবিছানো বেলা গেলো' (পৃ ১৩) কিংবা 'ফেটে-পড়া দিন, নীল জীবনের ছোঁয়াচলাগা আকাশ' (পৃ. ১৮) তখন রোমাঞ্চিত হতে হয়। কিছু কিছু চিত্রকল্পও অসামান্য:

'টম্যাটোর চামড়া ফেটে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত' (পৃ. ১০)
'গোপন আংটির মতো জোনাকি একটি দুটি
হঠাৎ ঝলকে উঠে আবার আড়াল' (পৃ. ১১)
'বারান্দাটি লণ্ঠনের মতো অনাড়ম্বরে জেগে আছে' (পৃ. ১১)
'আধমরা পাতাগুলি চমকে ওঠে বাতাসধমকে' (পৃ. ৬)
'হাই তুলে জানালাটা বন্ধ হয়ে গেলো' (পৃ. ১৮)
'এখন শহর পাহারা দিচ্ছে সৎমার মতো রাত' (পৃ. ২১)

দেবাশিসের কবিতায় কখনো কখনো জীবনানন্দের কণ্ঠস্বর শোনা গেছে। যখন তিনি বলেন 'সব উৎসবে বসে আছি' কিংবা 'বাসী, পচে যাওয়া মূলো এও তো দেখেছি', তখন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি-'র কবিকে মনে না পড়ে উপায় থাকে না। মাঝেমাঝে প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, দেবারতি মিত্র বা ভাস্কর চক্রবর্তীর নিচুগলায় কাটা-কাটা ছোট ছোট বাক্যে কথা বলার ভঙ্গিটিও মনে পড়ে। তবু মানতেই হবে দেবাশিসের একটি নিজস্ব সংবেদনশীল কবিমন রয়েছে। দুঃস্বপ্নের গভীরে এখন তাঁকে যেতে হবে, কবিতার আত্মাকে খুঁজতে হবে পট ও রঙের আয়তন ছাপিয়ে প্রবহমান সময়ের অগ্নিস্রোতে। 'সমসাময়িক'-এর মতো কবিতা যিনি লিখতে পেরেছেন, তাঁর বিষয়ে আমাদের অগাধ প্রত্যাশা।

বাঁশি

যেখানেই গেছে আমার বাঁশির সুর
তৈরি করেছে পথ
তুমি এসো

আমি দুধকারবারির ছেলে
দুধের থালায় মুখ দেখলেও
পদ্ম ছিঁড়তে গিয়ে জলে মুখ দেখবো
তুমি আর আমি
পদ্ম ছিঁড়তে গিয়ে পানিফল খুঁজবো
তুমি আর আমি
পানিফলের পায়েস কি সুস্বাদু

মাথার উপর বাঁশির সুর নিয়ে
কথা কইবে আমাদের পাখিরা

মনে রেখো

আমি আল হ'য়ে বাঁধবো ক্ষেতের শস্য
কোনো বন্যাই আমার আগল ভাঙবে না
করমচাঁদ, আমাকে মনে রেখো

একটা কিছু করতেই হবে
আমার মাথার উপর এত আলো
আমার চারপাশে এত হাওয়া
কিছু একটা করতেই হবে

মাছ মারি আর গানে গানে গ্রামের গল্পই করি
কিছু একটা করতেই হবে
আমারও দু'টো হাত দু'টো পা দু'টো চোখ
করমচাঁদ, আমাকে মনে রেখো

বাবা মা

বাবা আমাকে কাঁধে নিয়ে
ঘরে ফিরেছিল
বাবা আমাদের পুরনো লোক

আমি কাঁধে ছাগলছানা নিয়ে
ঘরে ফিরছি
ধুলো পথের পথ কেমন
পথের পাশেই পুকুর ছিল, পুকুরে ডুব দিয়ে
খুঁজে পেয়েছি তল
একথা বলতে বলতে বলবো :
বাবা আমাদের পুরনো লোক
মেলা থেকে আমাকে কাঁধে নিয়ে
ঘরে ফিরেছিল
মা আমাকে ঘুমপাড়ানি গানে
ভুলিয়েছিল অনেকদিন

আমাদের ল্যাণ্ডস্কেপ ও প্রার্থনা

যামিনী রায়ের ছবি তোমার মুখের রেখা এঁকে দিয়ে গেছে
চলো, আজ ভোর হ'তে নেমে যাই রেখার মুখের পাশে
গিয়ে, জলার সমস্ত ঘুম খোঁচা মেরে দেখি
মুখের রেখার পাশে এক দুই তিন চার উদ্বাস্তু কলোনী !

গজিয়ে উঠেছে চাঁদ, অপরূপ দূরে তোমার অমন মুখ
আঁকা বাঁকা দেরী করে ফিরেছে আকাশে ;
আজ বড় রাত্রিটুকু, দিনটিও ছোটো হয়ে মিশেছে মাটিতে
কিম্বা অন্য ভাবে
ফিরে যায় তোমার মুখের পাশে যামিনী রায়ের ছবি
ফিরে যায় রান্নাঘর, বায়ুর সকাশে ধোঁয়া
ফেরে গুপ্ত আঁধারের দিকে দিকে সশব্দ রজনী।

অদ্ভুত তোমার মুখ দুঃসময় ঘেরা, যেন প্রাচীর পারে না উঁচু হতে
যেন আঁচলের প্রান্তে এসে শেষ হয়ে গিয়েছে পৃথিবী !
এমনই আগুনময় অস্থিরতা—
বাড়ে ঢেউ, মুখ থেকে সরে যায় মুখের ও-ছবি

সুতরাং চলো আজ ভোর হতে নেমে যাই
রেখার মুখের পাশে আর জানু পেতে
বলি, পৃথিবী এসো, আগুনের মুখোমুখি কালক্ষেপ করি

রক্তশূন্য ক' মিনিট

চতুর্দিকে ছড়ানো বাকল, জল ও মণীষা
ঘড়ির কাঁটায় স্থির লজ্জাহত একাকী সময়
রক্তশূন্য ক' মিনিট
কানের দু'পাশে চুপ আবহাওয়া বাঘ
আবার সশব্দ স্নায়ু

ভালোবাসা, ঘুম…
কোথাও বালিশ থেকে দ্রুত সরে হাত
কোথাও চুম্বন।

ঘুম তুমি প্রতিরাত ফিরে যাও কেন?
ঘুম কেন ভালোবাসো স্নায়ুর বিকার?
ঐ অতো দীর্ঘ পথ, অতো বিস্তারিত ফর্দ,
অতো ঋণ কেন?

দাউদ হায়দার

কে বেশি?

সময় হলোনা যাওয়ার, সময়ের ছিল না বাকি—
এই হাতে যবে বেঁধেছিলে রাখী
স্মৃতির ভিতরে দেখি, কেউ কাঁদে ভিনদেশী
সে-কী তুমি না-আমি, কে বেশি?

প্রিয়তম, আজ সময় হয়েছে যাবার
অকুণ্ঠ ভালোবাসা পাবার
দিনগুলো বড়ো নির্মম।

বিদায় সাক্ষাতে অনুপম
যতবার ফিরে যেতে চাই
পক্ষাপক্ষে কেউ নাই
দেখি, আমি একা ভিনদেশী
কে কাঁদে, সে-কী আমি না-তুমি, কে বেশি?

জহর সেন মজুমদার

আজ

তোমার শহরের যুবকেরা আজ ভূমির পাশে
কেমন আশ্চর্য সব গান গাইছে। আমি
এক সদ্য কিশোর। কানপেতে শুনি।
যেন ক্রমে জেগে উঠছে একে একে প্রাচীন আত্মারা,
জেগে উঠছে মৃত চিঠি, স্বপ্নের হাতছানি,
জেগে উঠছে এই নম্র বাতাস, গূঢ় রাত,
আর চেয়ে আছে আধো চোখে লুপ্ত ইতিহাস।
নাগরিক খড়কুটোয় যে বাড়ী গড়া হোলো কাল
আজ তার কতোটুকু আয়ু?
হে যুবক, তোমাদের পদশব্দ কতোদূর যায়
আমি জানি না। শাদা দেয়াল দেখলে
তোমরা এখনো কি ভাবো শিল্পের কথা?
আমি এক সদ্য কিশোর। তোমাদের গান শুনে
আমার চোখও দেখতে পায় দূরের সব দৃশ্য।
জন্মভূমির পা ঘুঙুরে শব্দ তোলে কি-না
এই সত্য জানতে চাই আজ
বলবে তোমরা? আমি বিনিময়ে তোমাদের
নিশ্চয় ভালোবাসা দেবো।

তিনফুট ভাঁড়

নিজের বোনের সঙ্গে ফের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে পারবো ?
রেস্তোরাঁয় বাবা মাকে নিয়ে চা খেতে পারবো আর কোনদিন ?
তোমার কাছে কি অন্য কেউ যায় ? আমি গেলে আছড়ে পড়বো
আরেক নারীর পায়ে ? এই অন্ন, এই জল, এই অপমান ?

সে তখন করুণায়, নিজের গৌরবে পুরো ব্রেসিয়ার খুলে
আমাকে চিনিয়ে দিচ্ছে স্বর্ণযুগ, অন্যদিকে জ্যোতিষ্কের আলো
দেখে ভিখিরিরা আজ যে পথে গিয়েছে, সেই পথে অন্ন জল
টাকা সব আছে, আছে মরুদ্যান, পামগাছ, আরবের সোনা।

আমি কি তোমার কাছে এত ছোট ? তিনফুট ভাঁড়ের চেয়েও
রূপহীন ? রঙীন ঘাগড়া পরে নৃত্য করি চাঁদের আলোয়,
রাজার প্রমোদ যত বাড়ে, আমি তত লাল দৃশ্যটিকে দেখি :
মহিষীকে হ্যাড্ করে লম্পট হাসছে, দূরে কোষাগার লুঠ
কাক-মারাদের দল দরজা ভাঙছে, দেখো—গণ-অভ্যুত্থান।

তুমি নারী নও, তুমি অরণ্যের দিকে চলে যাওয়া জ্যোতিষ্ক
দীর্ঘায়ু পেয়েছি আমি, ঋষির উরস নিয়ে ঋষির কামনা,
জ্ঞান, অভিশাপ নিয়ে একা দাঁড়িয়েছি আমি তিনফুট ভাঁড়।

বর্ত্ম

আমার বিশ্রাম শেষ হলো, এবারের সরাইখানায়
দিব্যি কাটানো গেল একটা বছর, হাসিখুশি
মুগ্ধ সরাইখানা, তোমাকে ধন্যবাদ, আত্মার উষ্ণতা ;
এবার আবার শুরু সত্যির যাত্রায়, আর মাঝপথে
থামবো না কোথাও, জল তেষ্টা পেলে কিম্বা হাঁটু
ছড়ে গেলে সোনালি কাঁটায়, খুঁজবো না কোথায় ওই
এক তিলক আলো কুটিরের থেকে ভীরু অতিথিবৎসল
মেষপালকের ঘ্রাণ, এবার মাঝপথে আমি সত্যিই ধরবো না কারো হাত
যেমন ধরেছি পূর্বে, তোমাদেরও ধন্যবাদ,
যারা আমায় দিয়েছিলে খাদ্য জল, ঘুমের ব্যাঘাত
করোনি কখনো, শিখিয়েছো প্রত্যেকে কিছু না কিছুই
বেঁচে থাকবার মন্ত্র, সরাইখানারা, তোমরা সারে সারে
আমারই পথের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছো ?
কখনো দিয়েছো জল, কখনো দিয়েছো অভিশাপ

এইবারে শুরু হোক অ্যাড্ভেঞ্চার আমার,
মাঝপথে কাউকে ছোঁবো না আমি, তাকাবো না কারুর চোখের
পল্লবের উষ্ণ বিছানায়, প্রখর ঘুমের
লোভ থাকবো এড়িয়ে এড়িয়ে, যেমন এখন আছি ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলো ভুলে
আপাতত এই শহরের ধুলোমাটি সংগ্রহ করা বাকী আছে
কোনো সংবর্ধনা নেই, পুজো নেই কোনো
ছেড়ে যাবো শেষ শৈলাবাস, জলপ্রপাতের ছায়া
আর তো কখনো এসে পড়বে না চোখের কাঁটায়
বিদ্ধ খেজুর গাছ ঘিরে, তাকে ফেরানো যাবে না কিছুতেই
সেই দৃষ্টিশক্তি আমার, এবার চোখ বুজে শুরু
ভিতরের পানে, আত্মার উষ্ণ মাংস কেটে কেটে

তবু তো একদিন আমি একা একা পৌঁছে যাবো কথামালার
কচ্ছপের মতো, যাকে জন্ম থেকে শুরু করতে হয়েছিল
প্রকৃত সত্তার পথে চলা, কিন্তু কেবল একটা মহনীয় ঘোড়ার কথা ভেবে

সোফিওর রহমান

প্রার্থনা আগুনের

একটুকরো আগুনের জন্য
রাতা বাগানের বর্ধমান পথে
ঘুমিবার চলেছি
পুরুষের উত্তম শব্দ সমারোহ।

কবে সেই বনভূমিতে জেগেছিল জ্বালা
হেসেছিল পৃথিবীর প্রথম নারীটির মতো
রক্তের ভিতর রক্তিম পূর্ণিমায়।
রাত্রি ক্রমশ কৃষ্ণচূড়ার বাহার পেল আগো,
শীত ফ্রেমে তবু কেন বাঁধা এই যান্ত্রিক স্বাধীনতা?

অগ্নিহীন কালকূট নয়, পাথরের সাত্ত্বিক চুম্বন
আমাকে জিগির বানাক কিংবা রক্তাক্ত,
আগুন তো আর কিছু নয়
বুক খোলা অষ্টাদশী রাত্রিয়ার মতো
সদ্য লেখা কবিতার উত্তপ্ত আলিঙ্গন।

রাখাল বিশ্বাস

যে হাতে ছুঁয়েছি তাকে...

শহর ছাড়িয়ে যাই এখানে সেখানে ওই ভিতরের টানে
কে টানে বাইরে থেকে, কাকে টানে? বুঝিনি কিছুই
যদি তুমি বুঝে থাকো সব কথা খুলে বলো আজ
সহজ ব্যথায় কেন ভেঙে পড়ো, টুকরো টুকরো
কেউ ভাঙে, ভাঙে না কখনো।
বাঁকা জল বুকে নিয়ে যেতে পারি যেমন গিয়েছে নীল নদি
কথা কি ফুরিয়ে আসে, মুখোমুখি বসে থেকে আরো-অন্ধকারে
বারবার উড়ে যাই গন্ধময় নাভির দু'পাশে
যে হাতে ছুঁয়েছি তাকে বুকে রেখে সম্মোহন চাই
আড়ালে থেকেছি আমি বার বার আড়ালেই থাকি
শেষ হলে বেলা—
পৃথিবীর নির্জন ঘরের মধ্যে চলে যাবো বিরহ কাটাতে
যাকে তুমি নীরবতা বলো, যাকে বলো কোলাহল
অর্থহীন তারা আজ নেমে আসে লঘু চোখে, শুধু চেয়ে থাকো
বাগান ছাড়িয়ে এক কুসুম ফোটাতে।

যে দিন বিভূতিভূষণ

যদি সকলের আগে সেই তিথি আসে
আম কুড়োবার পরে তার ধুলোপোকা রেণুমাখা
এলোচুল উঠোনে বৃষ্টির নীচে
চন্দ্রবোড়া হয়ে শুয়ে থাকে
তবে ঘরে ফেরা পিতা ও নিষাদিনী
তার মুখ কোলে করে মাঠ প্রান্তে
রেখে আসে, সরল এই নিষাদাচার
পাথরের, সেই চুলে, শুদ্ধ অসার রসে
ডুব দিয়ে অন্য এক জন্মতিথি
আম কুড়োবার পরে, বাবলাবনের ফাঁকে
নদীটি দুভাগ হয়ে যাবে।

নিষ্পত্র

আমি পিতা ও পুরুষ বুঝিনা
আজ বুকে জড়ো করেছি কয়লা
আমাকে বেঁধে নিতে পারো অন্ধকারে
মুখে কয়লা উঠলে
আমাকে ছেড়ে চলে যেও।

অক্লান্তম, সাবলীল বাঙালী কবি

সাতের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আমি এই অনুরাধা মহাপাত্র-র কবিতা বিভিন্ন লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন-এ পড়ছি। এই দশকে যাঁরা কবিতা লেখা শুরু করেছেন এবং কবিতা লিখে যাঁরা কবিতা-পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অনুরাধা তাঁদের মধ্যে একজন। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমি 'ভাইরাস' নামে একটি কবিতার কাগজ সম্পাদনা করতাম, ঐ কাগজেও অনুরাধা নিয়মিত লিখতেন। তাই নানাভাবে অনুরাধার কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় এক দশকের। কিন্তু পাঠক হিসেবে আমার যা কাম্য ছিল তা হল এই পুস্তিকাটি, এই 'ছাই ফুল স্তূপ'।

বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দু'এক টুকরো কবিতা মাঝে মধ্যে পড়ে কোনো কবি সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বুঝে ওঠা যায় না। একত্রে গথিত হয়ে একটি গ্রন্থ বা পুস্তিকার মধ্যে বেশ কিছু কবিতা ধরা পড়লে তা থেকে একজন কবিকে নিশ্চিতভাবে চিনে নেওয়ার সুবিধে হয়। বুঝতে সুবিধে হয় এ কবি কতটা গ্রহণযোগ্য, কতটাই বা বর্জনযোগ্য, কিংবা আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা! সুখের কথা 'ছাই ফুল স্তূপ' অনুরাধাকে গুছিয়ে ধরতে পেরেছে ও তাঁকে এক চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। আমি ঐ কাব্য পুস্তিকাটির জোরে সাহস করে বলতে পারি, অনুরাধা গ্রহণযোগ্য কবি, যে অর্থে একজন যথার্থ কবি গ্রহণ-যোগ্য হয়ে উঠতে পারেন।

'ছাই ফুল স্তূপ' একটি নিরভিমান কাব্য পুস্তিকা, কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে খুবই শক্তিশালী। ৪০ পৃষ্ঠার এই কাব্য পুস্তিকাটিতে আছে মোট ৪৯টি কবিতা। ৪৯টি কবিতা, তার মানে, একজন কবিতা পাঠকের কাছে একত্রে তা যথেষ্টই। সেই গ্রন্থ রূপ দেওয়ার বিপুল ব্যয়ের দিকটা এভাবে এড়ানো গেছে, অথচ একজন কবিকে বুঝে উঠবার পক্ষে বেশ যথেষ্ট পরিমাণ কবিতাও 'ছাই ফুল স্তূপ'-এ রাখা গেছে। কাব্য পুস্তিকাটি চরিত্রের দিক থেকে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে বোধ হয় সুচিন্তিত সম্পাদনার গুণেই। আমার মতে ৪৯টি কবিতার মধ্যে অন্তত ৪৪টি কবিতাই পুস্তিকায় অপরিহার্য ছিল। একটি কাব্যগ্রন্থ বা পুস্তিকায় এতগুলি কবিতার সঠিক নির্বাচন এক দুরূহ সম্পাদনার সাক্ষ্য বহন করে, বলাই বাহুল্য। তবু কিছু কথা থেকে যায়।

অনুরাধার প্রচুর লেখা আমি পড়েছি, আরও প্রচুর লেখা হয়ত আছে, যা আমি পড়িনি। এর মধ্যে ৪৯টি কবিতাকে তুলে আনলে প্রশ্ন থাকেই, আর দু'পাঁচটি যোগ্য কবিতা বাদ পড়ে যায়নি তো? তবে, এটা প্রশ্নই, এর মীমাংসা হয় না এভাবে, বরং ভেবে দেখতে হবে বিপুল অনুরাধাকে ছাঁটাই করে যে অনুরাধাটুকু ধরা হল, তা অনুরাধার নির্যাস কিনা। আমার তো মনে হয়েছে, যতটা আমি অনুরাধাকে পড়েছি তার ভিত্তিতে, যতটা অনুরাধাকে আমি পড়িনি তার ভিত্তিতে নয়, যে এই কাব্য পুস্তিকার মধ্যে বর্জনের গুণেই অনুরাধা শক্তিশালী হয়েছেন। হয়ত এমনও হতে পারত, আরো পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়িয়ে অনুরাধার আরো কিছু কবিতা রাখা যেত, কেননা অনুরাধা গত দশ বছরে বহু কবিতাই লিখেছেন, কিন্তু তাতে বর্জনের থেকে গ্রহণের দিকটাই প্রকট হতো ও তার ফলে ক্ষতি হতে পারত, অনুরাধার এই চমৎকার 'ছাই ফুল স্তূপ' এমন চবিহীন, মহচেহীন হতে পারত কিনা সন্দেহ। এবং সম্প্রতি-কালে প্রকাশিত একটি বিশিষ্ট কাব্য পুস্তিকা হিসেবে 'ছাই ফুল স্তূপ' থেকে এ শিক্ষাটুকু আর একবার পাওয়া গেল যে বর্জন করতে পারার ক্ষমতা একটা বড় গুণ। নিজেকে সম্বরণ করার যোগ্যতাটা, অনুরাধার আছে।

'ছাই ফুল স্তূপ' পড়লে মনে হবে, এবং যা প্রথমেই মনে হবে, একজন কবির প্রথম গ্রন্থিত একটি কাজ কিভাবে এত নিপাট হতে পারে! প্রতিটি কবিতাই কি ভাবে এমন সুপাঠ্য হতে পারে! এত বাঙ্ময়, এমন ধ্বনিময় এতগুলি কবিতা মাত্র ৪০ পৃষ্ঠার আয়তনের মধ্যে ধরা যেতে পারে! অনুরাধার সামান্য চপলতাটুকুও,—যা প্রথম গ্রন্থিত রূপে থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়,—'ছাই ফুল স্তূপ'-এ নেই।

অনুরাধা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কবিতা লিখতে ভালবাসেন। মিথ্যাচাতুর্য, ধরতাই পঙক্তি, আড়ষ্ট বাক বিন্যাস আর উন্মার্গগামী কল্পনাকে যে অনুরাধা বর্জন করতে পেরেছেন, আর তার বদলে বাঙালী জীবনের মন্ময়তাকে, ব্যবহারিক জীবনের আশা-আকাঙ্খা ও স্বপ্নকে টুকরো টুকরো অনুভূতির স্বচ্ছতাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে ধরতে পেরেছেন, এতে আমরা আমি সুখী হয়েছি। কবিতা পাঠের শেষ যে বিমোহন তা আমি লাভ করতে পেরেছি। প্রতিটি কবিতা পড়ার পর মনে হয়েছে একটি সাবলীল ও সম্পূর্ণ কবিতা পড়লাম। এবং সম্পূর্ণ বইটি বার দু'তিন পড়তে আমার খুবই ভাল লেগেছে। এমনকি, অনেক কবিতা আমি বেশ কয়েকবার পড়েছি, মাঝে মাঝেই পড়ছি ও পরেও

পড়ার আগ্রহ আমার তৈরী হয়েছে। এসব কেন হয়েছে?

একটি অব্যর্থ জায়গায় পৌছেছেন অনুরাধা তাঁর 'ছাই ফুল স্তূপ'-এ। বাঙালী-চিত্তের, বাঙালী রসানুভূতির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে—যা আদি বাঙালী কবির ঐ মন্ময় 'গাথা'র মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে একদিন, 'গাথা সপ্তশতী' আর 'চর্যাপদ'-এর থেকে যা অন্তঃস্রাবী স্রোতের মতো আমাদের রক্তে প্রবাহিত হয়ে এসেছে আজ পর্যন্ত। অনুরাধার মধ্যেও সেই মন্ময়তা, সেই বহমান বাঙালী মন্ময়তা ধরা পড়েছে। এটা খুবই লক্ষণীয়। বোধ হয় এইখানেই আছে এক মৌলিক 'বাঙালীত্ব' এবং এই গুণেই বাঙালী কবিরা শেষ পর্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠেন।

আগেই বলেছি, বাইরের হঠাৎ ও তাৎক্ষণিক চমক, বেমানান চপল-চাতুর্য, শোম্যানশিপ, কষ্ট-কল্পনা, জিমন্যাসটিক বা ব্যায়াম—অনুরাধা পাত্তা দেননি। তার বদলে এক গাঢ় উন্মোচন, নির্ভার দ্যুতিময় এক একটি অনুভূতির দ্যোত নির্মাণ করেছেন অনুরাধা। ভাষা ও ভাবের সম্পর্ক হয়ে উঠেছে সাবলীল। অনুরাধার মধ্যে কখনো বাক্য গঠন প্রক্রিয়ায় অসম্পূর্ণতা থাকে, খুব লজিকাল অন্বয় হয় না, যেমন 'নক্ষত্রের ছায়া এসে বসে তার মুখে/আমি শেষ প্রশ্নের ছিপ/ভাবি একি সুন্দর?' এখানে 'নক্ষত্রের ছায়া এসে বসে তার মুখে', এবং 'ভাবি কি সুন্দর?'—এর মাঝে হঠাৎ একটা পঙক্তি 'আমি শেষ প্রশ্নের ছিপ'। সম্ভবত আমি শেষ প্রশ্নের ছিপ হয়ে বা দ্বীপের মত ভাবি—এরকম Syntax হওয়াটাই লজিক্যাল, কিন্তু অনুরাধা ঐ লজিক না মেনে কখনো কখনো ভালোই করেছেন; তাঁর কবিতায় সেটা দোষের না হয়ে বরং Stylized হয়েছে এবং একরকম নিজস্ব মাত্রা এনে দিয়েছে তাঁর কবিতায়। এসব কিন্তু কখনো কৃত্রিম বা বানানো বলে মনে হয়নি, বরং এটা তাঁর অজান্তেই ভিতরের প্রেরণা থেকে গড়ে উঠেছে বলে মনে হয়। যদিও সর্বদাই এ ধরনের কাব্য অন্বয় তাঁর কবিতায় কখনো কখনো আছে, এবং যেখানে যেখানে আছে তার সবক্ষেত্রেই তা খুবই মানানসইও হয়েছে। এর অর্থ এই যে, যে Stylization-এর কথা আমি বলেছি, তা এ কারনেই কৃত্রিম হয়ে পড়েনি। যদিও 'ছাই ফুল স্তূপ'-এ তাঁর এ ধরনের কবিতা খুব কমই স্থান পেয়েছে। নির্বাচনের সময় অনুরাধা এ ধরনের কবিতার দিকে একটু মমতা দেখালে ভালোই করতেন। তবু, পুস্তিকাটি একটি বিশেষ কারণে সুগ্রন্থিত। বোঝাই যায় যে কেবলমাত্র কবিতার দিকেই লক্ষ রাখা হয়েছে, অন্য কোনো বিশেষ কারু-

কাজের দিকে নয়—Style যাকে আমি বলেছি, তার দিকে তো নয়ই। এই পুস্তিকার বাইরে আরো যে সব কবিতা ওঁর আমি পড়েছি, তার কথা মনে পড়ায়—এই অবতারণা। কোনো কবির কাছ থেকে সব কিছু চাওয়ার পর শেষ পর্যন্ত তো আমরা কবিতাই চাই। তখন আর অনুরাধা অনুরাধা থাকেন না, হয়ে ওঠেন কবি। 'ছাই ফুল স্তূপ' থেকে আমরা একজন কবির বেশ কয়েকটি কবিতা পেয়েছি, এটাই চূড়ান্ত লাভ। ধারাবাহিক কোনো চিন্তার, অনুভূতির উন্মোচন নয়, বরং টুকরো অনুভূতির নানা বিকিরণ, যাত এই কাব্য পুস্তিকাটিতে রয়েছে। অনুরাধার ভাষা, আগেই বলেছি, সাবলীল এবং স্পন্দনশীল। 'জলের সহজে থাকে জল, নিজের ভিতরে থেকে নিজে / টান দেয় শর্তহীন বিষাদ প্রকৃতি' (বাণমন্ত্র)—'নিয়েছো আকাশমুখ/আমি নিই/দৈত্য বাগানের শেষ ফুল' (অপরাধময়)—'আমি খুলে দেবো শূন্য সিঁথি/তুমি দিও রাবণের লাবণ্য, (রাবণের লাবণ্য), 'যে গাছ নিশ্বাসে বিবাহে, /মরণাপন্নের মুখে ছায়া ফেলে, ছায়া ফেলে/চিরপূর্ণিমায় ডুব দিতে গেছে' (বিষধরী), 'থার্মোমিটারের নীচে ছোটবোনের অল্প লাবণ্য নিয়ে/ডাক্তার ও মায়ের কথা হয়' (ছোটবোনকে নিয়ে) এরকম বহু পঙক্তি তোলা যায় অনুরাধার সাবলীল ও স্পন্দনশীল ভাষার সমর্থনে। অনুরাধার কবিতায় চিত্রের কাজ, ছবির কাজ সত্যিই মুগ্ধ করে। এবং এ ব্যাপারে অনুরাধার স্বপ্ন-কল্পনা কতো জটিলতাহীন প্রাঞ্জল তাও প্রমানিত হয়। বহু উদাহরণ 'ছাই ফুল স্তূপ' থেকে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু আমি একটিই মাত্র ব্যবহার করব এখানে, যার দ্বারা তাঁর শক্তির খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

খেদিয়ে নিয়ে আসে কালো মাহুত গুহার কিশোরী বৃষ্টিরাতের গহন বর্শাটি
দিয়াশেলাই রঙের ফুলে, ফুলের জঙ্গলে
ধানের নৌকো, দাবা খেলার ঘোর
আর তখনই মগের পরে মগে ঢেলে শেকড়শরবৎ
মাথার ওপর নক্ষত্র নয়, কালো কাঠের ছাদ
(শিকার—পৃষ্ঠা, ১৭)

পঙক্তি তুলে তুলে তাঁর কবিত্ব শক্তিরও কিছু প্রমাণ দিতে ইচ্ছে করে, ভাবানুভূতির গাঢ়তায় তা কেমন হীরকদ্যুতি পেয়েছে, তা দেখাতে ইচ্ছে করে। দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

'জামরুল বনের পাশে বিধবা ও ঈশ্বরের কাচং
দেখা হলে তৎক্ষণাৎ একটি পেঁচা
তীব্র ডেকে ওঠে।'
(দ্বিতীয় পৃথিবী)

বা,

'যে মানুষ মাটিতে রক্তিন নয় সে কেমনে জয় করবে
ঈশ্বর ও মৃত্যুর মাঝে সেই দুরন্ত কোটাল?'
(নিষাদ)

বা,

'আমিই তার মরণ, আমি শান্ত বর্ণনীয়
মোষের কালো রেন্থ, মাখি, আমিই তার প্রিন্স'
(বর্ণনীয়)

বা,

বাসকপাতার উপর ভোমযুবতী মেলে দিয়েছে
বিষ নেশাভার, আজ তার গুণ করার দিন'
(বাসকপাতার ওপর)

বা,

'ডাক্তার ও মায়ের কথা বাতাসে অভিনীত হলে
অল্প লাবণ্যময়ী ছোটবোন নক্ষত্রের ইশারায়
শুধু বেঁচে থাকে!'
(ছোটবোনকে নিয়ে)

এই কাব্য পুস্তিকাটিকে যদি অনুরাধার প্রথম সোপান ধরি, তাহলে তো বলতেই হয়, ক্রমশ অগ্রসরমান অনুরাধা একদিন খুব বড় কবি হবেন, যদি না মাঝ পথে কোনো অন্তরায় ঘটে যায়।

এক অকৃত্রিম বাঙালী তরুনীর কাছ থেকে এই 'ছাই ফুল স্তূপ' পেয়ে আমি গর্বিত ও খুশি হয়েছি।

দু'টি কবিতা

ফেরীওয়ালী

মেয়েটির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিলো কাপড়ের মেলায়।
আমি তার কাছ থেকে কিনেছিলুম একটা রঙীন পাঞ্জাবী।
সে মনে রাখেনি আমায়, আমার মনে থেকে গিয়েছিলো
তার চিবুকের তিল।

তারপর এই শহরের নানান মেলায় তার সাথে দেখা হয়েছে আমার।
কখনও সে বিক্রি করেছে প্ল্যাষ্টিক বালতি, কখনও বই,
কখনও চামড়ার ব্যাগ, আবার কখনও রেকর্ড।
দূর থেকে তাকে দেখতে দেখতে আমি তার নাম দিয়েছিলুম ফেরীওয়ালী।

ফেরীওয়ালীর সঙ্গে শেষ দেখা হ'ল বিড়লা একাডেমীর মাঠে।
খোলা আকাশের তলায় হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়তেই
চমকে উঠলুম আমি।
এখানে কি বিক্রি করতে এসেছে ও ?
আদমের বিশাল মূর্তির সামনে দাঁড়িয়েছিলো ফেরীওয়ালী
তার চোখে বিস্ময় মেশানো অমোঘ মুগ্ধতা।

ফেরীওয়ালীর সঙ্গে শেষ দেখা হ'ল রেঁদার মেলায়।
সে জানলো না, তাকে দূর থেকে লক্ষ করছিলো একজন। আর,
আমি জানলুম, যে দেয় সে মাঝে মাঝে নিতেও আসে।

রবিবার

একজন সবল মানুষ বসে আছে শীতের রোদ্দুরে
তার হাতে খোলা বই আর পা ছড়ানো সামনের দিকে।
আজ কোথাও যাবার তাড়া নেই, আজ রবিবার।

নীল ডায়মণ্ড হাল্কাভাবে বেরিয়ে আসছেন
টেপ রেকর্ডার থেকে, আর
আর একজন মানুষ তুলি হাতে দেখছে নিজের ছবি,
চশমার কাঁচের ওপারে তার মগ্ন চোখ।
সিগারেটের নীলচে ধোঁয়া খুব লঘুভাবে ভেসে আছে
মাথার ওপরে।
আজ রবিবার।

আজ রবিবার তাই কেরাণী বসেছে কবিতার খাতা নিয়ে
টুকিটাকি দৃশ্য ঘুরে বেড়াচ্ছে স্মৃতির বাগানে
টুকিটাকি স্মৃতি বেরিয়ে আসছে কলমের ভেতর দিয়ে
সাদা কাগজের ওপর।

শৃংখল নেই, ব্যস্ততা নেই, ঘড়ির ভ্রুকুটি নেই,
প্রাণিত হবার দিন আজ, দাও গোরুর গা ধুইয়ে।

আজ রবিবার।

আবার দেবদারু কলোনী

হাতে কি সময় আছে? তবে ফাঁকি
দিয়ে চলে এসো মঙ্গলবারে, গানের ক্লাশ
করে কে আর গায়িকা হয়েছেন!

প্রণামের মত নীচু সাঁকো পার হয়ে
দেখবে পঞ্চায়েতের কলে টাইমের জল
এসে গেছে, কালো ও আদুল শিশুদের ছুটোপুটি
এদিকে কখনো তুমি তাকাবে না সোনা।

রাঙচিতার বেড়ার অন্তরালে কলেজের চটি পরে
ঢুকে পড়, সুব্রত সরকার আছেন?
সুব্রতদা, অকাদেমিতে নাটক করেন।

উনুনের পিঠে বসে আমরা চা খাই
অবিকল মানুষের চামড়ার মত রঙ, আসাম থেকে
চৈতন্যদেব মাসিমাকে সাথে করে
আমাদের বাড়ী এসে উঠেছেন।
রৌদ্রের আরামে বসে ছোট বোনের বিয়ের কথা হোল
রায়টের কথা হোল, বাঙালীদের অধঃপতন নিয়ে কথা হোল
কখন অলক্ষ্যে একটু রোদ এসে পড়েছিলো
বাবার মসৃণ ক্রাচে।

গলি থেকে দেখি জ্যোৎস্নায় পুলিশের ভ্যান ভিজছে
প্রায়ন্ধকারে অবৈতনিক ইস্কুলের দিদিমণি
সাইকেল রিকশা থেকে নামলেন নির্জনে
(হাওয়াই চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে, আপাতত
সেফটিপিনে আঁটা)
বাড়ী অন্য গ্রহে?

পথে কত তারার খোঁদল, আছে উল্কা, বিবিধ ভারতী
অনন্তের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ খেয়ালী হ'য়ে
হসপিটাল বস্তির পাশ দিয়ে চলে গেছে
অন্ধকারে নর্দমার ভিজে ও নরম স্পর্শ
কোথায় ঈশ্বর থাকেন, স্বর্গ কতদূরে?
ছেলেটির পোলিও হয়েছে তবু চোখ দু'টি
সন্ধ্যেবেলার মতো
নার্সেরা ভালবেসে নাম দিয়েছিলো সায়ন্তন কর।

কারা পার্টি করে, ফ্লাগে রক্ত মুছে মুছে
লাল হ'য়ে গেছে
পোষ্টারে এত বানান ভুল কেন, তোমাদের কি
ঘরে ফাউন্টেন পেন নেই?
টর্চের আলোয় রাত্রে লাশ নিয়ে যাবে যারা
তারা কি এখন অসীমের আদেশে ড্রেস করছে কোথাও?

আরো ভালোবাসা আছে কুকারের তলে
যখন ভাত ও মাখন নিয়ে মুখোমুখি বসি
পাতার মত মাথা নীচু করে আমিও চলে এসেছি
সংসারের ভীড়ে, ধুলো কোলাহলে, ব্যবসায়
যখন বাসাবাড়ীর কুয়োর শিকল পায়ে জড়িয়েছে
যখন ইলেকট্রিক ট্রেনের স্পর্শে মফস্বল অত্যুগ্র হয়ে উঠেছে
উদগ্রীব তরিতরকারি ও ডিম তখন টেম্পোতে উঠে পড়েছে
হৈ হৈ ক'রে, একটুকরো মাখন মাখানো রুটি মতন জমি
ভালো দাম পেলে মানুষেরা তা-ও বেচে দেবে।

মনোজ, বনান্তরে দেখা হবে যেখানে আকাশ কুসুম হ'য়ে ফুটে আছে
রাত্রে গল্পের মতো অল্প অল্প বরফ পড়ে
কয়েকজন সামান্য মানুষ আগুন জেলে প্রস্তুত করে খাদ্য

খবরের কাগজ থেকে দূরে
রেডিও অফিস থেকে দূরে
শীর্ষ সম্মেলন থেকে দূরে
তাদের কুটীর ক্রমশ গভীর হয়ে ওঠে চোরাই করাতের শব্দে
বন্য জীপ ও নয় হাতির মত বারবার হানা দেয় বন্যা ও শীত
ক্ষতি হয়, মাঝে মাঝে খুব ক্ষতি হয় কার্তিকদের গ্রামে

বৃদ্ধ-নিবাসের পাশে দাঁড়িয়ে আছে লাক্সারী বাস,
হ্যাপি ক্রিসমাস আজ হ্যাপি ক্রিসমাস
মিসেস ডরোথী মহলানবিশ পিঠে তৈরী করে এনেছেন
ডাঃ ভূপেন্দ্রমোহনের জন্যে
আর একটি ক্যাণ্ডেল জ্বলছে গম্ভীর ও নিস্তব্ধ স্টাডি রুমে
চার্চে দেখা হোল অনুপম ও শিল্পী তালুকদারের
দেখা যাক কে কাকে হারাতে পারে ?
এখন চলুক গান, বাইবেল পাঠ, বড়োদিনের উৎসব
ক্যাণ্ডেলের আলোয় কারা মাটি খুঁড়ছে, প'ড়ে আছে কফিন ও শব

আর সব সামান্য কথা, খবরের কাগজ আসে
শুরু হয় মর্নিং ইস্কুল
দেবদারু কলোনীতে শুরু হয় আরো একটি দিনের কিছু ভুল।

এখনো অবধি দিন

দয়িত বিরূপ হলে কালসিটে পড়ে যায় আমার জঙ্ঘায়

দধি খই ও শর্করা মণ্ড করে ছুঁড়ে দিই কাকের হামুগে
কুফরেশমের মতো ঝকমক করে ওঠে ওদের পালক
এরপর যতোবার কা কা করে ডেকে ওঠে ত্রিসীমানা জুড়ে
আরো ততদিন দেরী আছেস্বামী ফিরবার

ম্যাণ্ডারিন

খ্রীষ্টপূর্ব দুহাজার ঋতু আগে আমাদের দেখা হয়েছিলো

ভূমির ওপরে নতজানু, বৃষ্টি ও শস্যের জন্য
যে তুমি প্রার্থনা করেছিলে,
যে তুমি সুন্দর হাঁস ম্যাণ্ডারিন দেখেছিলে আকাশে তাকিয়ে
তখন নারীর স্তনে একটি বৃষ্টির বিন্দু পড়েছিলো এসে

শুরু হয়েছিলো পৃথিবীর প্রথম প্রণয়

স্বামীর কালো হাত

মশারী গুঁজে দিয়ে যেই সে শোয় তার
স্বামীর কালো হাত হাতড়ে খুঁজে নিলো
দেহের সাপ ব্যাঙ, লাগছে ছাড়ো দেখি,
ক্রোধে সে কালো হাত মুচড়ে দিলো বুক
বললো, 'শোনো শ্বেতা, চলানি করবে না

কখনো যদি ওই আকাশে ধ্রুবতারা
তোমাকে ইশারায় ডাকছে দেখি আমি
ভীষণ গাড্ডায় তুমিও পড়ে যাবে,
খেতার শ্বেত উরু শূন্যে দুলে ওঠে
আকড়ে ধরে পিঠ, স্বামীর কালো পিঠ।

গৌতম বসু

অঙ্গকথা

দোলতলার প্রকাণ্ড শূন্যতায় অর্ধেক পীত, অর্ধেক পাংশু
দেহও স্ববিরহী, জন্মের ভাতকাপড়ের ঋণবায়ু
উড়ে উড়ে ঘোরে, সেও চলে ;
গতি ক্রমে খননের দিকে, ভূতলে, যেখানে
এই কটি, বক্ষ আর চক্ষুষ্মান ললাটস্বদেশ
ভেঙে জলের জন্ম হওয়ার কথা, দুর্গন্ধময় সারের—
তার অসম্ভব কৃষিকাজ এই মাত্র, কল্পনায় হীন
রাধামাধবহীন ; হাওয়ার অতল অভাব।

দেবব্রত ঘোষ

গ্রহণ

নিয়চাপের ফলে এল মেঘ, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হল
ধান লাগান হল শেষ
কাঁচা রাস্তার দেশে
যোগাযোগহীন আমি বিচ্ছিন্নতা আশ্রয় করেছি
কিম্বা হয়ত বিচ্ছিন্নতা বলা ভুল হবে
আমাকে ঘিরেছে নদী, জেলেপাড়া, বুনো কুলঝোপ

কাঁচা সব্‌জির মায়া
উধাও নদীর দেশ
সাবানপুর দামাসিনি ফুলবেড়া নবজীবনপুর
কোনো সম্ভাষণ ছাড়া তোমাকে গ্রহণ করেছি

স্তব

যা অনায়ত্ত তারি ক্ষোভে দিন যাবে আরো

এই স্থিতি সত্য নয়, মিথ্যাও নয়
শুধু ভুল-বোঝাবুঝি
শুধু পরস্পর কাছে এসে ঝাপসা হয়ে যাওয়া

আশ্রয়ের খোঁজে আমি তলিয়ে দেখেছি
শহর, মফঃস্বল, অস্থিরচিত্ত গ্রাম
নিজের চাদ্দিকে সবাই প্রাচীর তুলেছে
কার কাছে যাই ?

জানি : যা অনায়ত্ত তারি ক্ষোভে দিন যাবে আরো
এ যে মাটি
কেন ভুলে যাই ক্রমাগত
এ যে নগ্ন মাটি

রাই কিশোরী

তোমার জন্য জমা ছিল, জমা আছে, অনেক বন্ধুতা, রানী
তুমি তার ব্যবহার জানো না
না জানলে
তোমার প্রতিটি কোষ মুহূর্তে জ্বালিয়ে দিতে পারি

অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়

মানুষের কাছে যাওয়া

হৃদয়ের পথগুলি এলোমেলো, মানুষের কাছে
পায়ে হেঁটে যেতে গিয়ে অভ্যস্ত পথের ধারে পাশে
যতো নালানর্দমার গর্ত সব কী অমোঘ টানে
অদৃষ্টের মতো—মূঢ় পা-দুখানি অযাচিত ভাবে
টলে যায়, ব্যক্তিত্ব কেবলি ভেঙে হয় তছনছ
যেন মদোমাতালের খসে-পড়া লক্ষ্যহীন বোধ
স্পষ্টত ধুলোর মতো উড়ে গিয়ে লুটোয় আঁধারে,
খুলে পড়ে চশমা, কাছা, হাতের মুঠোয় থাকে ধরা
অবশ্য তবুও ভালোবাসা—ফের বিপুল বিশ্বাসে
অদৃশ্য সুতোর টানে প্রেরণার টানে লোকালয়ে
ছুটে যেতে চায় কি পা-জোড়া। নাকি অভ্যস্ত পথের
দাগগুলি মুছে গিয়ে ভ'রে যায় আগাছা জঙ্গলে
ততোদিনে! কুয়াশার দিগ্বিদিক তুমুল ভরেছে
দেখি আজ—মানুষের কাছে যাওয়া হবে কি সহজ!

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

বিমলা

এই শীতে মরে গেছে বিমলার বাপ
বিমলার শিশু
চারপাই ছুঁয়ে ছুঁয়ে কখনও দাঁড়ায়
ধুলোবালি মাখে।
বিমলার পাংশু মুখে কিছু দোলাচল
শীতে সে আসবে, কথা ছিল।
পুষ্যা নক্ষত্রের রাত
ব্রহ্মপুত্র ছুঁয়ে-আসা হাওয়া
ঝাপটা মারে
এই শীত, এই পুণ্য স্নান কী আশায়
শীত কতদিন?

বিমলার সামনে শিশু ক্রমশ দাঁড়ায়।

দেবদাস আচার্য

মন্ত্র

লোকরহস্যের মধ্যে নির্বাসিত, ভাগিরথী ব-দ্বীপের লোক
হে আমার মৃদু আত্মা, এ মানুষের পাশে তুমি
জাগ্রত হবে কি?

সারারাত আকাশে উড়েছে বক, বহু
সারারাত জুড়ে ঝরেছে চাপ চাপ শান্ত কুয়াশা
দিনের আলোয় দিন ফুটে ওঠে
রাতের আঁধারে রাত গাঢ় হয়

এসবের মাঝে, নীরবে, একদিন
আমি তোমার সঙ্গেই কিছু কথা বলতে চাই

প্রেতের মতন

ভেঙে যেতে দিয়েছি প্রাসাদ
উপেক্ষায় ঔদাসীন্যে এমন কি বিষাদে :
পায়রারা উড়ে গেছে, সময় নিশ্চল
ভগ্নউরু ঘড়ির মিনারে।

রিক্সা, বাস রাস্তা দিয়ে চ'লে যেতে যেতে
একবার দেখে যায়, একবার ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
তারপর মনেও রাখে না।

এখন জ্যোৎস্নায়
অলৌকিক লাগে তবু ভগ্নশেষ বাড়ী।
অনেক দূরের থেকে ধেয়ে আসে অদ্ভুত বাতাস,
ভয়ংকর আক্রমণ করে এক ধূসর সুগন্ধ,
আর আমি—বিধ্বস্ত, বিকল—প্রার্থনায় কৃতাঞ্জলি :
কেবলই প্রার্থনা করি,
কার কাছে নিজেও জানি না।
আমি শুধু থেকে যাই—শুধু থেকে যাই
আমারই প্রজ্ঞায় ধ্বস্ত ইঁট্ কাঠ বালির সম্মুখে :
হতভম্ব, ঈষৎ বা বিচলিত,
ঈষৎ বা ভ্রষ্ট এক প্রেতের মতন।

পাঁক

ছেলেবেলা এক বাছুরের কাণ্ড দেখে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল মেয়েটি। গোবৎসটি জন্মেই তুমুল হাম্বারবে চারদিক সচকিত ক'রে, ছুটতে ছুটতে মাঠটা দু'চক্কর নিল ঘুরে তারপর মায়েরকাছে ফিরে, আয়েষ ক'রে দুধ খেয়ে, জগতের সঙ্গে বোঝাপড়ায় হ'লো তৎপর। যেন এই তার লাইফটাইল্! রোজকার অভ্যেস!

অথচ মানুষ কী অসহায় ভাবে আসে পৃথিবীতে। শুধু পাশ ফিরতেই লাগে কতদিন।

শঙ্খচূড়, কেউটে ইত্যাদি সাপের ব্যাপারও বেশ ইন্টারেস্টিং! এ প্রসঙ্গে বোধহয় আগে আসা উচিত ছিলো। জলের পর তো ডাঙার কথা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সাপরা কেমন খোলস পাল্টায়। বছরে দু'বার তো বটেই, পোষ মানলে আরো। যত বেশি জলে থাকা, তত বেশি খোলস ছাড়া।

আমরা তো এসব কিছুই পারি না।

হয়তো মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজীব বলেই তার জীবনের স্তরও অনেক। কত-দিন, শীত-গ্রীষ্ম, ভাল-মন্দ ও সুখ-দুঃখের টানা-পোড়েনে আসে পূর্ণতা! তার ভাবের ঘরে কতো অমূল্য সম্পদ—অন্তর্দৃষ্টি, সংবেদনশীলতা, কল্পনা, চিন্তা, যুক্তি অনুভূতি। মিলনের চরম মুহূর্তে। মানুষই পায় পূর্ণের আকাশ। আবার দুঃখকষ্টের আগুনে পুড়ে খাঁটি হয় জীবন।

পচা পানাপুকুরের নোংরা পাঁকেই সহস্রদল পদ্মের জন্ম। তেমনি অনেক কাদা ও পাঁক ঘুলিয়ে, শেষে, পরতে পরতে দল মেলে জীবন-কমল। তাই কি সে এত সুন্দর?

দুটি বিপরীত ভাবের পাশাপাশি সহবাস। ঘাস জমেছে উঠোনে।

চন্দন ঘষতে ঘষতে সুগন্ধ। পুড়তে পুড়তে সার্থক ধূপের কাঠি। জীবন ক্ষয়ে ক্ষয়ে পৌঁছোয় চূড়ান্ত এক চূড়ায়।

ছাদের রং

গোপালপুর পালিয়ে গেলাম। শুধু দিনকয়েকের মতো। সবাই জানলো একা গেছি। আসলে কিন্তু দোকা।

লুকিয়ে যাবো বললেই তো আর যাওয়া যায় না। কত ঝামেলায় পড়তে হয়। আমরা তা পাইনি বরং পেয়েছি প্রকৃতির নিঃশব্দ শরীরের স্পর্শ। কারণ খুঁজিনি। লাভ হতো না কিছু। সকালে ওখানে পৌঁছেই ষ্টেশন থেকে হোটেল। সমুদ্রের কোল ঘেঁষে। দোতালার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে সে কী বুক দুরদুর। চেনা লোকের কঠিন চাউনির ভয়। পাশের ঘরেই হয়তো। না, ছিলো না। পাশের ঘরেও না। না, অন্যকোন ঘরে। আশ্চর্য রকম ফাঁকা। যেন, হোটেলেই নয়, নিজেদের বাড়ী।

সমুদ্রে চান হলো যেমন হয়। আরো বেশি কিছুও হলো। আরো কিছু বেশি। জাম্বো বলে একটি লোক জুটে গেলো আমাদের সাহায্য করতে। ফেললো বেঁধে বাঁশ ও মাদুর ছাউনির পরিপাটি ঘর একটি। চানের ফাঁকে 'রেষ্ট' নেবার জন্য। বীয়ার, জীন, মাছভাজা এল। সমুদ্র তীর ফাঁকা।

এখানকার জলের স্বাদ নোনা। গাঁজার ধোঁওয়াকেমন? দেখতে ছিলো না বাধা। বাধা ছিল না কোন কিছুরই।

বার বার উঁচুতে হল ওঠা। সহজেই। রাতে, অনেকবার আরব্য রজনীর কথা মনে এলো। মাথার উপর আকাশের চাঁদোয়া। চাঁদের আলোয় ভরা। অনেক তারার ঠাস বুনোট। 'বাগদাদ' শব্দে আছে দূরের হাতছানি। মোহ। তাই অত মনে আসছিল? সমুদ্রের ফুঁসিয়ে-ওঠা ঢেউগুলি কালো ঠেকছিল আর ফেনাগুলি সাদা। লাস্ট ফর্ লাইফ। নিশুতি রাতে উঠেছিলাম হোটেলের ফাঁকা ছাদে। চমকে উঠেছিলাম আমরা। অমন ছাদ তো দেখিনি কোথাও। ভাবা যায় না। রেলিং সমেত আগাগোড়া দুধের মত শাদা। চাঁদের নরম আলোয় অন্ধকার-হারিয়ে দেয়া শাদা। ঠিক আকাশের নীচে, শুয়েছিলাম অনেক রাত। ঘুম পারেনি 'ডিসটার্ব' ক'রতে।

এত টুকরো টুকরো সুখ গেঁথে গোটা একটা মালা গাঁথা হলো কি? পৃথিবীতে অমনটি হয় কখনো? মন, প্রাণ, দেহ মথিত ক'রে যে পূর্ণ ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাকে কেন ধ'রে রাখতে পারি না চিরদিন?

মনতালের "Poet in our Time" প্রসঙ্গে

ইতালির বিখ্যাত কবি ইওজেনিও মনতালের গদ্যগ্রন্থ "Poet in our Time" নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, উনি এই বইটিতে লিখেছেন কবিতা ও শিল্প বিষয়ে তাঁর দীর্ঘকাললব্ধ উপলব্ধির কথা; দ্বিতীয়ত, পরিপার্শ ও জগজ্জীবন সম্পর্কে একজন আধুনিক কবির অকপট বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে এখানে; এবং সর্বোপরি, মনতালের অবিস্মরণীয় গদ্যশৈলীর জন্যে। গ্রন্থটি রচিত হয়েছে এখানে ওখানে প্রকাশিত আলোচনা-সমালোচনার সংক্ষিপ্তসার, শাক্ষাৎকারের প্রশ্নোত্তর, বিশেষ-সংখ্যা পত্রিকার প্রবন্ধ, ইত্যাদি, একত্রে মিলিয়ে। মূল ইতলিয়ান থেকে বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন অ্যালাস্টেয়ার হ্যামিলটন।

বইটির মুখবন্ধে মনতালে লিখছেন: "Besides, there has been no such thing as a completely rational poetry for many years". "Rational Poetry" বলতে মনতালে কী বোঝাতে চাইছেন তা স্পষ্ট অগিগম্য হ'লো না আমাদের—উনি যদি নব্যক্লপদী যুগের যুক্তিনিষ্ঠ, আবেগবর্জিত, চিন্তানির্ভর কবিতার কথা বল'তে চাইছেন, তাহ'লে তাঁর সঙ্গে আমি একমত। নাকি উনি জানাতে চাইছেন যে আধুনিক কবিতামাত্রই ডাডাইষ্ট বা স্যুররিয়া-লিষ্ট রীতিতে রচিত কবিতা (ওঁর নিজের কবিতা কিন্তু তা নয়)? যদি তা-ই হয়, তাহলে আমি বলবো "উনি ঠিক লিখছেন না"। এর একটু পরেই উনি মন্তব্য করছেন "Poetry differs from prose beause it only refers to itself; it can only be explained in its own context, on its own terms." জঁ পল সার্ত-ও তাঁর "What is Literature" গ্রন্থে প্রায় একই কথা লিখেছেন। কবিতা একটি স্বতন্ত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয় —কবিতা বহির্ভূত অন্য কোনো প্রসঙ্গের অভিনিবেশে তাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। সার্ত সেইজন্যে কবিতার চেয়ে গদ্যকে বেশি পছন্দ ক'রতেন, কারণ গদ্যকে দিয়ে অনেক কিছু বলিয়ে নেয়া যায়, সুদে খাটানো যায় আরো অনেক বেশি। কোনো আমেরিকান কবি তাঁর কোনো একটি কবিতায় কাব্যবিষয়ে প্রায় একই সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। বিষয়টি, বলা বাহুল্য, তর্কসাপেক্ষ, কিন্তু সার্ত, মনতালে, বা ম্যাকলীসের কবিতা-ভাবনাকে এক কথায় উড়িয়ে

দেবার কোনো উপায় নেই। এমন কি, এই ১৯৮৪সালেও।

বইটির প্রথমেই মনতালে আমাদের চতুষ্পার্শ্বের অন্তঃস্পন্দের চরিত্রলক্ষণ নির্ণয় ক'রতে গিয়ে "despair" এবং "mysterious, inexplicable love", এই দুটি সূত্রের উল্লেখ করেছেন। উনি ঠিকই করেছেন। আমরা কি মুংকের "Howl" ছবিটির চরিত্রের মতো ব্রীজের ওপরে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে উঠি না মাঝে মাঝে, আবার একইসঙ্গে আমরা কি অনুভব করি না বিশ্বচরাচর এবং মানুষজন সম্পর্কে এক রহস্যময়, অকথ্য ভালোবাসা ? আমরা অনেকেই তা-ই করি, হয়তো সচেতনভাবে নয়, তবু করি।

কিছু পরেই, মনতালে জানিয়েছেন যে আমাদের তথাকথিত সভ্যতার প্রধান অসুখ হ'লো "a lack of interest in the sense of life"। উনি ঠিকই লিখেছেন। আমাদের কর্মচর্চা ও শিল্পকর্ম যদি জীবনবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে তা ধোপে টিকবে না ব'লে মনে হয়। বিখ্যাত শিল্পতাত্ত্বিক বার্নার্ড বেরেনসন তাঁর "Aesthetics and History" গ্রন্থে (১৯৪৮ সালে প্রথম প্রকাশিত), অনেক আগেই প্রায় একই কথা জানিয়ে গিয়েছিলেন : "Not all ideated sensations are artistic, but only those that are life-enhancing". যাঁরা ফতোয়া-কবিতা রচনা করেন, বা যাঁরা শুধু বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের (বিশুদ্ধ সৌন্দর্য কাকে বলে ?) পূজারী, তাঁরা এই প্রাথমিক সূত্রটি প্রায়ই বিস্মৃত হন। শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও।

মনতালে, তারপরে যে লিখেছেন "the malady of modern man as the progressive loss of a centre", তা অবশ্য অনেকেই জানিয়েছেন নানাভাবে। ইয়েটসের সেই বিখ্যাত কবিতাটির কথা মনে ক'রতে পারি আমরা, যার একটি পঙক্তি হচ্ছে : The centre cannot hold, mere anarchy is loosed in the world"।

শুধু ইয়েটস কেন, আরো অনেক কবি ও বুদ্ধিজীবী এই একই উপলব্ধি উচ্চারণ করেছেন নানাদেশে। আমরা স্পেনের দিকপাল বুদ্ধিজীবী অর্তেগা গ্যাসেটের নাম মনে ক'রতে পারি এই প্রসঙ্গে। তিনি যে আধুনিক সভ্যতায় "dehumanization"—এর কথা বলেছেন, তার অন্যতম কারণও কি এই উৎকেন্দ্রিকতা ? তিনি এ-বিষয় স্পষ্ট কিছু লেখেন নি, কিন্তু তাঁর বক্তব্য থেকে এই সিদ্ধান্তে হয়তো আসতে পারি।

বিজ্ঞাননির্ভর আধুনিক জীবন "energy"-র দ্বারা শাসিত, এই প্রসঙ্গে

ভাবতে গিয়ে মনতালে একটি আকর্ষণীয় মন্তব্য করেছেন : "But to show a preference for energy rather than idealistic reason or the unknown God does not solve any problems : it is merely a change of labels"। আমি মনতালের সঙ্গে অংশত একমত। আধুনিক জীবনে, বিজ্ঞানে, এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় "energy-"-র ভূমিকা খুব কম নয়, এমনকি তা কখনো কখনো শ্লাঘনীয়, কিন্তু এই প্রচণ্ড শক্তির অপব্যবহার যে ক্ষতিকর সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মনতালে, অবশ্য, শুধু তা-ই বলছেন না। উনি জানাতে চাইছেন যে, আমরা যদি এক ঈশ্বরের পুজো ছেড়ে আরেক ঈশ্বরকে পুজো করি, তাহ'লে তা নাম বদল ছাড়া আর কিছু নয়। "energy", মনতালের মতে, তাহ'লে ঈশ্বর, এবং আমাদের ধর্ম-নিয়োজিত ঈশ্বর তবে কি "Unknown God" ? আমরা কেউ কি এ-বিষয়ে শেষ কথা ব'লে ফেলতে পেরেছি ? মনে হয় না, আমার অন্তত তা মনে হয় না।

মনতালে তাঁর সময় ও কাল-কে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন ("I accept the age in which I live")—সৎ কবিমাত্রই যা ক'রে থাকেন। স্বকালের সমর্থক হিসেবে না হ'লেও, অন্তত সমালোচক হিসেবে। প্রায় একই সূত্রে মনতালে জানিয়েছেন যে আমাদের সভ্যতা হ'লো মূলত "visual"। তার সঠিক অর্থ কি ? শহরে শহরে সিনেমার পোষ্টার, বিজ্ঞাপন, নিয়নের আলো, ইত্যাকার বিষয় ভেবেই কি উনি এই মন্তব্য করেছেন ? দীর্ঘদিন আগে, এক জার্মান ঐতিহাসিকের কোনো গ্রন্থে পড়েছিলাম যে, যুগসন্ধির সময়ে আমরা পুরো-আকার-না-পাওয়া অথচ বাস্তব, এমন অনেক জিনিসকে শুধু এক পলকে দেখে নিতে পারি, কখনো কখনো তাকে প্রকাশ ক'রতে পারি চিত্রকল্পে, চিত্রকলায়, তার বেশি নয়। মনতালে কি তা-ই ব'লতে চেয়েছেন ? আমার তা মনে হয় না। মনতালে আরো জানাচ্ছেন "The fragmentation of technology has also entered the field of moral sciences"। তাঁর এই উক্তি বহুলাংশে সত্য, কিন্তু আমাদের না মনে রেখে উপায় নেই যে যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা যদি শতধাবিভক্ত হয়, তবে তার সমান্তরপতিক ভাঙাগড়া ঘটে চ'লবেই আমাদের অন্তর্জীবনে। কিন্তু এই মন্তব্যটি কর'বার কিছু পরেই তিনি যে লিখেছেন, যে আধুনিক শিল্পকর্ম আর Subjective বা মন্ময় নয়, শুধু ধারণার অভিব্যক্তি, তার সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত নই। কয়েকবছর

আগে আমেরিকায় "Conceptual art" নামে যে শিল্প আন্দোলনটি গ'ড়ে উঠেছিলো তার ব্যর্থতার কারণও সম্ভবত এই।

পরের অনুচ্ছেদে এই লেখক একটি উজ্জ্বল উক্তিতে জানিয়ে দিয়েছেন আধুনিক কবিতার অন্তর্লোকের নৈঃশব্দের অনুরণনময় ব্যঞ্জনার কথা: "Read the poetry of today: you cannot trust the words since the words are of today, but their meaning must be sought between the lines"।

কিছু পরে মনতালে যে লিখেছেন "For many years poetry has been becoming more a means of knowledge than of representation", তার সারবত্তা কি আমরা সম্যকভাবে উপলব্ধি কর'তে পেরেছি। কবিতা তথা শিল্প শুধু ভালেরী-কথিত খেলা বা game নয়, কবিতা হ'লো অন্যান্য জ্ঞানের মতোই আরেকটি জ্ঞান। এই প্রসঙ্গে, পাঠককে বিখ্যাত আমেরিকান কবি ও সমালোচক অ্যালেন টেটের "Literature as Knowledge" (The Man of letters in the modern world, পৃ: ৩৪-৬৩) পড়ে দেখতে বলি। এই প্রবন্ধ থেকে দুটি মন্তব্য আমি উদ্ধার করছি: (১) "Poetry is 'thought and art in one'" (২) "What, then, is the subject of the lyric? Is it all feeling, nothing but feeling? It is a feeling about 'ideas' not actions" একই অনুচ্ছেদে ওয়ার্ডসওয়ার্থের উক্তির আংশিক প্রতিধ্বনি ক'রে মনতালে যে লিখেছেন "The poet needs a truth which talks of that which unites man to other men, without denying all that separates man and makes him unique," তা বহুলাংশে সত্য। তার কিছু পরে এই ইতালিয়ান লেখক আরেকটি আকর্ষণীয় মন্তব্য করেছেন "Poetry is the universal activity of the single man, the infinity of the limited individual"। পরের অনুচ্ছেদে মনতালে যে লিখেছেন "Furthermore, the romantic notion that art is born life rather than from already existing art is rarely confirmed in history", তার মূল বক্তব্য আমি পুরোপুরি সমর্থন করতে পারি না। কবিতা নানাধরণের হ'তে পারে, কিন্তু যে কবিতা জীবনঘনিষ্ঠ তাতেই আমি সবচেয়ে বেশি সাড়া দিতে পারি। এতৎসত্ত্বেও মনতালের

এই মন্তব্যও বহুলাংশে সঙ্গত যে "Only the isolated communicate. The others—the men of mass communication—repeat, echo, vulgarize the works of the poets"

দু' একটি অনুচ্ছেদ পরে পাস্কালের মতো সবিস্ময়ে মনতালে মন্তব্য করেছেন: "But marvel, wonder, is the aim of all men, whether they are poets or not, and art is not a sum of figures to be added together: it is a leap,…"। একই পরিচ্ছেদে তিনি জানিয়েছেন শিল্পকর্মের একটি মূল সূত্র: "The problem of the creative artist is to make them appear to be something new despite the existence of an almost infinite number of precedents—for the series of combinations is unexhaustible," এবং আরো একটি: "Today we read a Greek fragmant or a dizain by Maurice Scive as if we were reading a poem written yesterday. We read it in a flash of psychological time,…"।

সবশেষে উনি জানিয়েছেন যে যে-যুগে উনি জন্মেছেন তাকে উনি ভালোবাসেন, কেননা সমকালের স্রোতোধারায় ভেসে ভেসে বেঁচে থাকা ছাড়া সৎ শিল্পীর কোনো গত্যন্তর নেই। তিনি পৃথিবীর সমস্ত কবিকে সাবধান করে দিয়েছেন: "a poet must not turn his back on life".

পাঁচটি কবিতা

শ্রীমতী ঋতু গুহ সমীপেষু

ঋতু গুহ, তোমার গান আমার অনেকদিন থেকেই ভালো লাগে।
কালকে যখন রেডিও-তে রবীন্দ্রসংগীত শুনলাম :
থাকতে আর তো পারলি নে মন, পারলি নে—
তখন আমি তোমায় টেলিফোন করতে চেয়েছিলাম।
তুমি কিংবা তোমার স্বামী বুদ্ধদেব, কেউ বাড়িতে ছিলে না।
দীর্ঘদিন আগে, বিড়লা কলামন্দিরে, তোমার গান প্রথম মুখোমুখি
শুনেছিলাম,
তুমি একটু হাঁ-ক'রে গাও, শব্দ খুব স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করো,
শুধু কি তাই ? নাকি আরো অন্য কিছু আছে ? তুমি জানো,
আমি শুধু তীব্রভাবে অনুভব করি, প্রায় তৃষিত এক গাছের মতো—
শব্দ আর সুর, আর তার সঙ্গে বুকের ভেতর থেকে-জেগে-ওঠা
অন্ধকার আবেগ—নইলে তোমার গান আমাকে ঠিক এমন ভাবে
স্পর্শ করতো না। ধরো, কোথাও জল ঝরছে, মাটির ওপর
কেঁপে উঠছে ঘাস-চারা, তখন কেউ কেমনভাবে সাড়া দেবে ?
আমি আমার কথা ব'লতে পারি। আমি জেগে উঠবো চেঁচিয়ে-ওঠা
শিশুর মতো। গান শুনেও মানুষ বাঁচতে পারে।
তোমরা একদিন এসো, তোমার গান ঠোঁটের ওপর মধু-র মতো
একটু একটু ক'রে চেখে নেবো। জড়িয়ে দেবো ইন্দ্রিয় হৃদয়।
কবে আসবে ? কাল তোমায় টেলিফোনে পাইনি।
আজ হয়তো পেতে পারি ॥

টেলিভিশনে সুপ্রীতি ঘোষের গান

সুপ্রীতি ঘোষ, বিখ্যাত গায়িকা, অনেকদিন পরে তাঁর গান শুনে
বুকের ভেতর একটু কেঁপে উঠলো। এরকম হয়, হ'য়ে থাকে।
ফাঁকে ফাঁকে কখন যে এগিয়ে আসে জলধারা, কে তাকে রুখতে পারে,
কেন বা রুখবে, কার দায়!
"ভ্রমর সেথা হয় বিবাগী, নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে"—
রবীন্দ্র সংগীতে এক মায়া আছে, ইয়েট্‌স জানতেন, এমনকি স্বয়ং লেখক
নাবালক থেকে আবালবৃদ্ধ বনিতার মুখে শুধু রবিগান।
কিন্তু ভ্রমর ? বিশেষত বিবাগী ভ্রমর ? তার ঘর, কে জানে কোথায় ?
কোন্ কান্নাহাসির কথা শুনতে চায় ও ? কেন চায় ?
কোথাও ফুটেছে পদ্ম, তার রং নীল. সে কিছুটা নিভৃত।
ভীত আমরা কেউ নই, তবুও কেঁপে কেঁপে উঠি মাঝেমাঝে, কাঁপি নাকি ?
সব ফাঁকি মুছে যায়, আঁখি কিছু ভার, অনিবার
কার্যকারণে, মনে মেঘ জমে, মেঘ ভেসে যায়—
বিদায়, হে চপলতা ; বিদায়, সস্তার খেউড়,
বিদায়, আধুনিক বাংলা গান ; বিদায়, মরমী বাগান ;
বিবাগী ভ্রমর ওড়ে, পাখা নাড়ে, তারপর আর কিছু নেই ॥

পূরবী

পূরবী মুখোপাধ্যায়ের গান "একদা কী যেন, কোন পুণ্যের বলে"—
রেডিওতে ভেসে এলো। তার পরের দুটি শব্দ "হে সুন্দর" নিয়ে
কিছুক্ষণ ভাবলাম। নাম যাই হোক, "সুন্দর" কাকে বলে?
রবীন্দ্রনাথ হয়তো জানতেন, অনেক গানে কবিতায় শব্দটিকে
ব্যবহার করেছেন। অনুভবও করেছেন। ভোর বেলায়, উপাসনার সময়।
হয় এইভাবেই একটা থেকে অন্য একটা কিছুর জন্ম। পূরবী, আপনাকে
অজস্র ধন্যবাদ, আপনি নতুন ক'রে আবার সবকিছু জাগিয়ে দিলেন মনে।
অনেকদিন আগে, সাতান্ন কি আঠান্ন সালে, শিয়ালদার বাড়িতে
আমি এবং যূথিকা ব'লে একটি মেয়ে দেখা করেছিলাম। মনে আছে?
নবনীতা পাঠিয়েছিলেন। আপনি তখন অন্য একটি গান গেয়েছিলেন:
"তোমারই ঝর্ণাতলার নির্জনে, মাটির ঐ কলসখানি ছাপিয়ে গেলো।"
কাল রাত্রে, এই দুটি গান একসঙ্গে মিশে যাচ্ছিলো—
নীল ও সবুজ, সাদা এবং হলুদ. কিংবা শুধু জলের সঙ্গে জল
যেমন মিশে যায়, অনেকটা সে রকম। গমগম ক'রে ওঠে শব্দ।
"ঝর্ণাতলা" "কোন্ পুণ্যের বলে" এখন ছড়িয়ে পড়ে
সমস্ত শহরে। আমি ঘরে ব'সে বুঝতে পারলাম,
যাকে আমরা ভালো-লাগা বলি, তার শিহর যে-কোনো দিন,
যে কোনো মুহূর্তে, কেঁপে উঠতে পারে। বারেবারে
আমি শুধু একবার অতীত, আর অন্যবার বর্তমানের মাঝে
সেতু বাঁধতে চাইলাম। পেরেও ছিলাম হয়তো। পারিনি কি,
শ্রীমতী পূরবী?

মোহিনী অট্টম

প্রথম ফুল-চয়ন, পরে পুষ্পধনু, ছিটকে-আসা তীক্ষ্ণ মৌমাছি,
পরে আবার পায়ের তাল সমান রেখে মালা গাঁথা—
মোহিনী অট্টম।
এসেছিলেন মন্দাকিনী ত্রিবেদী, গাছগাছালি-ভরা কেরালায়,
টেলিভিশন দেখতে দেখতে আমি শুধু মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রয়েছিলাম॥
হাতে যেন একটু একটু ক'রে ফুল-ফোটার মতো মুদ্রা, একবার
ওপর দিকে তোলা, অন্যবার আরো একটু নিচে—
আলো-আঁধার-দিয়ে বোনা, আনমনা, চঞ্চলিত, চপল,
পুরো জীবন যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিলো হাওয়ায়—
কোথায় কবে সব কিছু পাথর-ফাটা জলের মতো চমকে উঠেছিলো,
এখনো তা বহে যাচ্ছে, আমরা শুনি. কখনো শুনি না.
কে যে কাকে নাচায়? যায়, পুরো একটা জীবন বুঝে নিতে।
রমণী শুধু কমণীয় শরীর নয়, আগুন দিয়ে ঘেরা
মস্ত এক অন্ধকার – সাচীকৃত, প্রাচীন.....
আমি শুধু তাকিয়ে দেখছিলাম
কেমন ক'রে মন্দাকিনী দেবী
সব কিছু ছুঁয়ে, আবার ছুঁড়ে দিচ্ছেন ঘূর্ণ্যমান আলোয়
ঘুঙুর-পরা পায়ের সেই পুরনো রম্ ঝম্ –
মোহিনী অট্টম॥

যামিনী কৃষ্ণমূর্তির "সপ্তপদী"

টেলিভিশনে, যামিনী কৃষ্ণমূর্তির "সপ্তপদী" দেখে মনে হ'লো
আমি আবার নতুন ক'রে
জন্মজীবনের সঙ্গে, বিবাহে চলেছি।
ওঁর পায়ের তালে যেন ছোটো ছোটো ঢেউয়ের টুকরো
আছড়ে পড়'তে চেয়েছিলো এই বুকের ওপরে।
আমি তাদের সামাল দিতে গিয়েও কেন শেষাবধি
পেরে উঠতাম না, এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি।
কামনা এক অন্ধকার সমুদ্র, লালের-ছিট-লাগা,
তাকে আমি কেমন ক'রে ফিরিয়ে দেবো?
যদিও বিবাহ প্রধানত শাসন-মানা-ছন্দ, আলোড়ন।
আমি এখন তাকে ছড়িয়ে দিচ্ছি আরো বাইরে
যেখানে পুরো জীবন থরথরিয়ে কেঁপে উঠছে পায়ের পাতার নিচে,
বট-অশথ ঝুরি নামায়, ঝুরি নামায়, ঝুরি—
শিকড়বাকড় জড়িয়ে আছে, সেখানেও নৃত্যভঙ্গিমা।

আমি এখন, অনেক দিন পরে,
জন্মজীবনের সঙ্গে বিবাহে চলেছি।
ধন্যবাদ, যামিনী কৃষ্ণমূর্তি॥